আরকানুল ইসলাম বা ইসলামের স্তম্ভসমূহ।

ⓒ الجامعة الإسلاميّة، ١٤٢٤هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر

مجموعة من الباحثين بعمادة البحث العلمي

المدينة المنورة ١٤٢٤هـ

أركان الإسلام / مترجم إلى اللغة البنغالية

ترجمه إلى اللغة البنغالية/ محمد إبراهيم عبد الحليم

١١٦ص، ١٧×٢٤ سم

ردمك:٣ -٣٧٥-٢ ٠-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١- أركان الإسلام ٢-العبادات (فقه إسلامي)

ب العنوان

ديوي ٢٥٢ ١٤٢٤/٩٨٧

رقم الإيداع ١٤٢٤/٩٨٧

ردمك :٣ - ٣٧٥-٠٢-٩٩٦٠

أركان الإسلام.

আর্‌কানুল ইসলাম বা ইসলামের স্তম্ভ সমূহ।

الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

প্রথম স্তম্ভ ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল" এ সাক্ষ্য দেওয়া।

এ দু' সাক্ষ্য ইসলামে প্রবেশ পথ, ও তার মহান স্তম্ভ। কোন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারবে না যতক্ষন না সে এ দু' সাক্ষ্য মুখে উচ্চারণ করবে ও সাক্ষ্যদ্বয়ের দাবী অনুযায়ী আমল করবে।

আর এ সাক্ষ্য দানের মাধ্যমেই এক কাফির মুসলিম হয়ে যায়।

١- معنى شهادة أن لا إله إلا الله:

১- আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এই সাক্ষ্য দানের অর্থ ঃ

আর তা হলো ঃ এর অর্থ জেনে ইহা মুখে উচ্চারণ করা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে এর দাবী ও চাহিদা অনুযায়ী আমল করা, আর এর অর্থ না জেনে এবং এর দাবী অনুযায়ী আমল না করে শুধু মুখে পাঠ করা সকলের ঐক্যমতে কোন উপকারে আসেনা। বরং তার বিরূদ্ধে হুজ্জত হবে।

আর (**لا إله إلا الله**) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ হলো ঃ এক আল্লাহ সুবহানাহু ও তা'আলা ছাড়া প্রকৃত পক্ষে কোন সত্য মা'বুদ-উপাস্য নেই।

এ কালেমার দু'টি রুক্‌ন রয়েছে। (النفي والإثبات) আন্‌নাফি-

অস্বীকৃতি জানানো, ওয়াল ইছবাত-স্বীকৃতি জানানো।

অর্থাৎ-আল্লাহ ছাড়া সব কিছুর উপাসনা অস্বীকার করা, এবং সে উপাসনা একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা, যার কোন অংশীদার নেই। তাগুতের অস্বীকার করাও এই কালেমার অন্তর্ভুক্ত।

তাগুত-হলো ঃ আল্লাহকে ছেড়ে মানুষ, পাথর, বৃক্ষ ও প্রবৃত্তি ইত্যাদির পূঁজা-উপাসনা করা। আর তাকে (তাগুতকে) ঘৃণা করা ও তা হতে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করাও এ কালেমার অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর ঃ যে ব্যক্তি এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করেছে অথচ আল্লাহ ছাড়া যে সকল বস্তুর ইবাদাত করা হয় তা অস্বীকার করে নাই সে এই কালেমার দাবী পূরণ করে নাই।

এ প্রসংগে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

﴿وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٦٣].

অর্থ ঃ তোমাদের ইলাহ্-উপাস্য হলেন এক ও অদ্বিতীয়, আর সে মহান করুনাময় দয়ালু ব্যতীত সত্যিকার কোন মা‘বুদ- উপাস্য নেই। [সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৬৩]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿لا إكراه في الدِّين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم﴾[سورة البقرة، الآية: ٢٥٦].

অর্থ ঃ দ্বীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নাই, সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহকে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মযবূত হাতল ধরবে যাহা কখনও

ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। [সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-২৫৬]

আর (الإله) ইলাহ্ এর অর্থ ঃ ইলাহ্ অর্থ সত্য মা'বুদ-উপাস্য। আর যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করে যে ইলাহ্-উপাস্য হলেন তিনি যিনি সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, বা নতুন কিছু আবিস্কারে ক্ষমতাশীল, এর দ্বারাই ঈমান সৌন্দর্য লাভ করে, ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর একাত্বতা ঘোষণা করা ছাড়াই।

সে ব্যক্তির (لا إله إلا الله) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ "আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই" মুখে উচ্চারণ করে ইসলামে প্রবেশ করা দুনিয়াতে কোন উপকারে আসবে না। আর আখিরাতে স্থায়ী শাস্তি হতে এই কালেমা তাকে মুক্তি দিবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون﴾[سورة يونس، الآية: ٣١].

অর্থ ঃ বল ঃ কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি কার কর্তৃত্বাধীন ? কে জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হতে নির্গত করে এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে ? তখন তারা বলবে ঃ আল্লাহ। বল ঃ তবুও কি তোমরা সাবধান হবেনা ? [সূরা য়ূনুস-আয়াত-৩১]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنّى يؤ فكون﴾

[سورة الزخرف، الآية:٨٧].

অর্থ ঃ যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ। তবুও তারা কোথায় ফিরছে ?। [সূরা আল-যুখ্‌রুফ-আয়াত-৮৭]

٢- شروط كلمة التوحيد:

২- কালেমায়ে তাওহীদ এর শর্তসমূহ ঃ

(১) ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভাবে অর্থ জানা, যা অজ্ঞতার পরিপন্থী।

নেতিবাচক হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য ইবাদাত সাব্যস্ত না করা। আর ইতিবাচক হলো তা (ইবাদাত) এককভাবে তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা। তাঁর কোন অংশীদার নেই তিনিই একমাত্র ইবাদাতের মালিক ও হক্বদার।

(২) এই কালেমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, যা সন্দেহের পরিপন্থী।
অর্থাৎ ঃ এই কালেমার দাবীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আন্ত-রিকভাবে নিশ্চিত হয়ে মুখে উচ্চারণ করা।

(৩) এই কালেমাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করা, যা প্রত্যাখ্যাণের পরিপন্থী।

আর তা হলো এই কালেমার সকল দাবী-চাহিদা ও তার বক্তব্য গ্রহণ করা। সংবাদ সমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখা, আদেশ সমূহ পালন করা। নিষেধ সমূহ হতে বিরত থাকা। কুরআন ও হাদীসের দলীল পরিত্যাগ ও অপব্যাখ্যা না করা।

(৪) অনুগত হওয়া, যা ছেড়ে দেওয়ার পরিপন্থী। আর তা হলো এই কালেমা যে সকল বিধানের নির্দেশ দিয়েছে তা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে আনুগত্য করা।

(৫) (এই কালেমাকে) সত্য জানা, যা মিথ্যার পরিপন্থী। আর তা হলো বান্দা এই কালেমাকে সত্য জেনে অন্তর হতে উচ্চারণ করবে।

এই কালেমা পাঠ কারীর অন্তর তার কথা মোতাবেক হবে, এবং তার বাহ্যিক অবস্থা আভ্যান্তরীণ অবস্থার মুয়াফিক হবে।

অতঃপর যে ব্যক্তি এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করেছে আর তার দাবীকে অস্বীকার করেছে নিশ্চয়ই তার এই মুখে উচ্চারণ তার কোন কাজে আসবে না, যেমন মুনাফিকদের অবস্থা ছিল। তারা এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করতো অন্তরে অস্বীকার করতো।

(৬) পূর্ণ একনিষ্টতা থাকা, যা শিরকের পরিপন্থী। আর তা হলো বান্দা আমলকে নেক নিয়াতের দ্বারা শিরকের সকল প্রকারের গ্লানি হতে মুক্ত রাখবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء﴾

[سورة البينة، الآية: ٥].

অর্থ ঃ তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে ইবাদাত করার। [সূরা আল-বায়্যিনা-আয়াত-৫]

(৭) এই কালেমার সাথে মুহাব্বাত-ভালবাসা রাখা, যা বিদ্বেষের পরিপন্থী।

আর ইহা বাস্তবায়িত হবে, এই কালেমাকে, তার দাবীকে, তার নির্দেশিত বিধানকে এবং যারা এই কালেমার শর্ত মোতাবেক চলে তাদেরকে ভাল বাসার মাধ্যমে। আর উল্লেখিত কথা গুলোর বিপরীত কথার সাথে বিদ্বেষ রাখার মাধ্যমে।

এর নিদর্শন হলো ঃ আল্লাহর প্রিয় বস্তুকে প্রাধান্য দেওয়া, যদিও তা প্রবৃত্তির বিরোধ হয়। আর আল্লাহর যা অপছন্দ তা অপছন্দ

করা, যদিও তার দিকে প্রবৃত্তি ধাবিত হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যাদের বন্ধুত্ব রয়েছে তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যাদের শত্রুতা রয়েছে তাদের সাথে শত্রুতা রাখা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده﴾ [سورة الممتحنة، الآية: ٤].

অর্থ ঃ তোমাদের জন্য ইব্‌রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শুরু হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যতক্ষন না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। [সূরা আল-মুম্‌তাহানা-আয়াত-৪]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشدّ حباً لله﴾ سورة البقرة، الآية:١٦٥].

অর্থ ঃ তথাপি কেহ কেহ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভাল বাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম। [সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৬৫]

আর যে ব্যক্তি ইখলাস ও ইয়াকীনের সাথে (لا إله إلا الله) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, "আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই" একথা বলবে এবং সকল পাপাচার, বিদ'আত, ছোট শিরক ও বড় শিরক হতে মুক্ত থাকবে, সে দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট হতে হিদায়াত পাবে। আর আখিরাতে শাস্তি হতে নিরাপত্তা পাবে। তার উপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে।

এই শর্ত গুলো পূর্ণ করা বান্দার উপর আবশ্যক। আর এই শর্ত গুলো পূর্ণ করা অর্থ হলো যে, এই শর্ত গুলো একজন বান্দার জীবনে সমাবেশ ঘটা এবং তা জানা অত্যাবশ্যক হওয়া। তবে ইহা মুখস্থ করা জরুরী নয়।

আর এই মহান কালেমা (لا إله إلا الله) (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু) হলো তাওহীদুল উলুহীয়্যাহ, যা তাওহীদের প্রকার সমূহের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ এক প্রকার তাওহীদ, এ বিষয়েই নাবীগণ ও তাঁদের সম্প্রদায়ের মাঝে মতনৈক্য সংঘটিত হয়েছিল। আর এরই বাস্তবায়নের জন্যে রাসূলগণকে প্রেরণ করা হয়েছিল।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾[سورة النحل، الآية: ٣٦].

অর্থ ঃ আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমরা তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি। [সূরা আল-নাহ্ল-আয়াত-৩৬]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون﴾ سورة الأنبياء، الآية: ٢٥].

অর্থ ঃ আমরা তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তাঁর নিকটে এই ওহী অবতীর্ণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বুদ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। [সূরা আল-আম্বিয়া,আয়াত-২৫]

আর যখন শুধু তাওহীদ বলা হবে, তখন তা হতে মুরাদ-উদ্দেশ্য হবে তাওহীদুল উলূহীয়্যাহ।

:تعريف توحيد الألوهية তাওহীদুল উলূহীয়্যাহ এর সংজ্ঞা ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টি জীবের উলূহীয়াত ও উবূদীয়াতের মালিক, তিনি এককভাবে ইবাদাতের মালিক তাঁর কোন শরীক নেই এই স্বীকৃতি দেওয়া।

: أسماؤه তার (তাওহীদুল উলূহীয়্যার) নাম সমূহ ঃ এই তাওহীদকে তাওহীদুল উলূহীয়্যাহ বা ইলাহীয়্যাহ বলা হয়েছে কারণ একনিষ্টভাবে ইহা নিছক তা'আল্লুহ (تألـه) এর উপর প্রতিষ্ঠিত। একক আল্লাহর জন্য অধিক ভাল বাসাকে তা'আল্লুহ বলা হয়।

নিম্নে বর্ণিত নাম গুলো তাওহীদুল উলূহীয়্যার নাম ঃ

(ক) তাওহীদুল ইবাদাহ বা উবূদীয়াহ ঃ কারণ ইহা এক আল্লাহর জন্য ইবাদাত হওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(খ) তাওহীদুল ইরাদা ঃ কারণ ইহা আমলের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(গ) তাওহীদুল কাছদ ঃ কারণ ইহা এক আল্লাহর জন্য ইবাদাতকে একনিষ্ঠ অত্যাবশ্যক করে এমন একক ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(ঘ) তাওহীদুত ত্বলাব ঃ কারণ ইহা আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে চাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(৬) তাওহীদুল আমল ঃ কারণ ইহা আল্লাহ তা'আলার জন্য আমলকে একনিষ্ঠ করার উপর প্রতিষ্ঠিত।

حكم توحيد الألوهيـــة: তাওহীদুল উলূহীয়্যাতের হুকুম বা বিধান ঃ তাওহীদুল উলূহীয়্যাহ সকল বান্দাদের উপর ফরয। বান্দারা কেবল মাত্র এর দ্বারাই ইসলামে প্রবেশ করে। আর এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আমল করলেই জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর এ বিশ্বাস এবং এ মোতাবেক আমল করা সর্ব প্রথম ওয়াজিব। আর এর দ্বারাই দাও'আত ও শিক্ষা শুরু করা সর্ব প্রথম ওয়াজিব। যারা এর বিপরীত ধারণা করে তারা এতে মতনৈক্য করেছে।

কুরআন ও হাদীসে এর ফারযিয়াতের নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ এরই বাস্তবায়নের জন্য সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করেছেন এবং কিতাব সমূহ অবতীর্ণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب﴾[سورة الرعد، الآية:٣٦].

অর্থ ঃ বল ঃ আমি তো আল্লাহর ইবাদাত করতে ও তাঁর কোন শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি। আমি তাঁরই প্রতি আহ্বান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন। [সূরা রা'দ-আয়াত-৩৬]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [سورة الذريات، الآية: ٥٦].

অর্থ ঃ আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে। [সূরা আয্-যারিয়াত-আয়াত-৫৬]

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুআয (রাযিআল্লাহু আনহু) কে বলেন ঃ

((إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) الحديث، [أخرجه البخاري ومسلم].

অর্থ ঃ (হে মুআয রাযিআল্লাহু আনহু) তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো। সর্ব প্রথম তাদেরকে (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-) আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই-এই দিকে আহ্বান কর। যদি তারা এই দাও'আত গ্রহণ করে তোমার আনুগত্য করে, তখন তুমি তাদেরকে জানাও যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা ইহা গ্রহণ করে, তখন তুমি তাদেরকে জানাও যে, আল্লাহ তোমাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, ইহা ধনীদের কাছ থেকে নেওয়া হবে এবং দরিদ্রদেরকে দেওয়া হবে। আল-হাদীস, [বুখারী ও মুসলিম]

এই তাওহীদ যাবতীয় আমল সমূহের মধ্যে অধিকতর উত্তম আমল ও অধিক পাপ মোচন কারী। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও মুসলিম সাহাবী ইত্বান (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

((فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله))

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামকে হারাম করেছেন যে, ব্যক্তি আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে।

(চ) সমস্ত রাসূলগণের এই কালেমার উপর ঐক্যমত ঃ

সমস্ত রাসূলগণ তাঁদের সম্প্রদায়কে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর দিকে দাও'আত দানে এবং ইহা হতে বিমুখের ভয় প্রদর্শনের ব্যাপারে একমত ছিলেন।

যেমন কুরআন কারীমে অনেক আয়াতে এর বর্ণনা এসেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدونِ﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ٢٥].

অর্থ ঃ আমরা তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তাঁর নিকটে এই ওহী অবতীর্ণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বুদ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। [সূরা আল-আম্বিয়া-আয়াত-২৫]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই কালেমার দিকে দাও'আত দানে নাবীদের একমতের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে ঃ

((الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد))

অর্থ ঃ নাবীগণ এক অপরে বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। তাঁদের মা ভিন্ন ছিল, আর দ্বীন একছিল।

সকল নাবীদের মূল দ্বীন ছিল একই তা হলো তাওহীদ, যদিও শরী'আতের অন্যান্য বিধি-বিধান ভিন্ন ছিল। যেমন কখনো ছেলে-মেয়ে মায়ের দিক হতে ভিন্ন হয়, আর তাদের পিতা এক।

٣– معنى شهادة أن محمداً رسول الله:

৩ – মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দানের অর্থ ঃ

(ক) নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দানের অর্থ হলো ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা আদেশ করেছেন তা পালন করা, যে সব খবর দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা, এবং যেগুলি সম্পর্কে নিষেধ ও সতর্ক করেছেন সেগুলি থেকে বিরত থাকা, আর একমাত্র তিনি যে বিধান দান করেছেন সেমত আল্লাহর ইবাদাত করা।

(খ) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য বাস্তবায়ন ঃ

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য বাস্তবায়ন হবে ঈমান ও পূর্ণ ইয়াকীন দ্বারা। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, যাকে সকল মানব ও জ্বিন জাতীর নিকট প্রেরণ করেছেন। তিনি শেষ নাবী ও রাসূল। নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর নৈকট্যর্জনকারী বান্দা। তাঁর মাঝে উলূহীয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট নেই। তাঁর অনুসরণ করা, তাঁর আদেশ নিষেধের সম্মান করা। কথায়, কাজে ও বিশ্বাসে তাঁর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿قل يا أيّها النّاس إنِّي رسول الله إليكم جميعاً﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٥٨].

অর্থ ঃ বল ঃ হে মানুষ ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল। [সূরা আল-আ'রাফ-আয়াত-১৫৮]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً﴾ [سورة سبأ، الآية: ٢٨].

অর্থ ঃ আমরা তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। [সূরা সাবা-আয়াত-২৮]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾ [سورة الأحزاب، الآية: ٤٠].

অর্থ ঃ মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নাবী। [সূরা আল-আহ্যাব-আয়াত-৪০]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿قل سبحان ربّي هل كنت إلاّ بشراً رّسولاً﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٩٣].

অর্থ ঃ বল ঃ আমার প্রতিপালক পবিত্র ! আমি কেবলমাত্র একজন মানুষ যাকে রাসূল বানানো হয়েছে। [সূরা আল-ইস্রা-আয়াত-৯৩]

উক্ত সাক্ষ্য নিম্নে বর্ণিত বিষয় গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে ঃ

প্রথমত ঃ তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রিসালাতের স্বীকৃতি দেওয়া ও অন্তরে তার বিশ্বাস রাখা।

দ্বিতীয়ত ঃ এর উচ্চারণ করা ও মুখের দ্বারা প্রকাশ্য ভাবে এর স্বীকৃতি দেওয়া।

তৃতীয়ত ঃ যে সত্য তিনি নিয়ে এসেছেন তা অনুসরণ করা, এবং যে বাতিল বিষয় সমূহ নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿فآمنوا بالله ورسوله النبيّ الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ﴾ [سورة الأعراف، الآية:١٥٨].

অর্থ ঃ সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নাবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হতে পার। [সূরা আল-আ'রাফ-আয়াত-১৫৮]

চতুর্থত ঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে সব খবর দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা।

পঞ্চমত ঃ জান, মাল, ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা, ও সকল মানুষের ভালবাসার চাইতে তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে) অধিক ভালবাসা। কারণ তিনি আল্লাহর রাসূল, আর তাঁকে ভালবাসাই হলো আল্লাহর ভালবাসার অন্তর্ভুক্ত।

আর তাঁর প্রকৃত মুহাব্বাত হল তাঁর আদেশ সমূহের আনুগত্য করে তাঁর নিষেধ সমূহ হতে বিরত থেকে তাঁর অনুসরণ করা। তাঁকে সাহায্য করা, তার সাথে বন্ধুত্ব রাখা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم﴾ [سورة آل عمران،الآية: ٣١].

অর্থ ঃ বল ঃ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। [সূরা আলি-ইমরান-আয়াত-৩১]

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ

((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)) [متفق عليه من حديث أنس – ﷺ–].

অর্থ ঃ তোমাদের কেহ পূর্ণ মু'মিন হতে পারে না যতক্ষন আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও সকল মানুষের চেয়ে অধিকতর প্রিয় না হবো। [ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীসটি আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন]

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿فالّذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعو النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون﴾ [سورة الأعراف،الآية:١٥٧].

অর্থ ঃ সুতরাং যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁকে সম্মান করে, তাঁকে সাহায্য করে এবং যে নূর তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে উহার অনুসরণ করে তাঁরাই সফলকাম। [সূরা আল-আ'রাফ-আয়াত-১৫৭]

ষষ্টত ঃ তাঁর সুন্নাতের প্রতি আমল করা। তাঁর কথাকে সকলের কথার উপর প্রাধান্য দেওয়া, নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করা। তাঁর শরী'আত মোতাবেক বিধান পরিচালনা করা এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿فلا وربِّك لا يؤمنون حتىّ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً﴾ [سورة النساء، الآية:٦٥].

অর্থ ঃ কিন্ত না, তোমার প্রতিপালকের শপথ ! তারা মু'মিন হবে

না যতক্ষন পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিস্মবাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সমন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে উহা মানিয়া না লয়। [সূরা আন-নিসা-আয়াত-৬৫]

٤ – فضيلة الشهادتين:

৪- সাক্ষ্য দ্বয়ের ফযিলত ঃ

কালেমায়ে তাওহীদ এর অনেক ফযিলত রয়েছে যা কুরআন হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তার কিছু ফযিলত নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

(ক) ইহা ইসলামের প্রথম স্তম্ভ, দ্বীনের মূল, মিল্লাতের ভিত্তি, এর দ্বারাই বান্দা সর্ব প্রথম ইসলামে প্রবেশ করে। এর বাস্ত-বায়নের জন্যই আসমান জমিনের সৃষ্টি।

(খ) ইহা জান মাল হিফাযতের কারণ, যে ব্যক্তি ইহা উচ্চারণ করবে তার জান মাল হিফাযতের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

(গ) সাধারণ ভাবে ইহা সর্ব উত্তম আমল, অধিক পাপ মোচন কারী, জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম হতে মুক্তির কারণ। যদি আসমান ও জমিন এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অপর পাল্লায় রাখা হয় তবে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর পাল্লা ঝুঁকে যাবে বা ভারী প্রমাণিত হবে।

তাই ইমাম মুসলিম উবাদাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে মারফু' হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

((من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله حرّم الله عليه النّار))

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া

কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম কে হারাম করে দিবেন।

(ঘ) আর ইহাতে যিকির, দু'আ ও প্রশংসা সন্নিবেশিত রয়েছে। দু'আউল ইবাদাহ ও দু'আউল মাসআলা এর অন্তর্ভুক্ত। আর এ যিকির অধিক মাত্রায় পাওয়া যায় এবং ইহা অতি সহজে অর্জন করা যায়। ইহা পবিত্র কালেমা, দৃঢ় হাতল, কালেমাতুল ইখলাস, এর বাস্তবায়নের জন্য আসমান জমিনের সৃষ্টি। এর জন্যই সৃষ্টি জীবের সৃষ্টি, রাসূলগণের প্রেরণ, কিতাব সমূহের অবতীর্ণ, এরই পরিপূর্ণতার জন্য ফরয ও সুন্নাত প্রবর্তন হয়েছে। আর এরই জন্য জিহাদের তরবারী উমুক্ত করা হয়েছে।

অতঃপর যে, ব্যক্তি ইহা পাঠ করবে ও এর প্রতি আমল করবে সত্য জেনে, ইখলাসের সাথে, গ্রহণ করে ও মুহাব্বাতের সাথে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তার কর্ম যাই হউক না কেন।

الركن الثاني: الصلاة

দ্বিতীয় রুক্ন ঃ আস্সলাত (নামায)।

নামায ইবাদাত সমূহের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ ইবাদাত। এর ফরয হওয়ার দলীল অত্যন্ত সুস্পষ্ট, ইসলাম এ বিষয়ে খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে। সুতরাং ইবাদাত সমূহে নামাযের ফযিলত ও তাৎপর্য কতটুকু তা বর্ণনা করেছে। আর ইহা বান্দা ও তার প্রভুর মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি কারী, ইহা প্রতিষ্ঠার দ্বারা বান্দা তার প্রভুর আনুগত্য প্রকাশ করে।

١– تعريفها:

১- নামাযের সংজ্ঞা ঃ

:لغة - শাব্দিক অর্থ ঃ নামাযের শাব্দিক অর্থ দু'আ, এই অর্থ কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكن لهم﴾[سورة التوبة،الآية: ١٠٣].

অর্থ ঃ তুমি তাদের জন্য দু'আ কর, তোমার দু'আ তাদের জন্য চিত্তস্বস্তকর। [সূরা আত্তাওবাহ-আয়াত-১০৩]

:واصطلاحاً - পারিভাষিক অর্থ ঃ ইহা এমন এক ইবাদাত যা বিশেষ কিছু কথা ও কর্মকে শামিল করে, আল্লাহু আকবার দ্বারা শুরু হয়, আস্সালামু আলাইকুম দ্বারা শেষ হয়।

: والمراد بالأقوال কথা হতে উদ্দেশ্য হল ঃ আল্লাহু আকবার বলা, ক্বিরাত, তাসবীহ, ও দু'আ ইত্যাদি পাঠ করা।

:والمراد بالأفعال - কর্ম দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ ক্বিয়াম-দাঁড়ানো, রুকু

করা, সিজ্‌দা করা ও বসা ইত্যাদি।

٢– أهميتها لدى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام:

২- নাবী ও রাসূলগণের (আলাইহিমুস্‌ সালাম)-নিকট এর গুরুত্ব ঃ

আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রেরণের পূর্বের আসমানী দ্বীন সমূহে নামায বিধিবদ্ধ ছিল। ইব্‌রাহীম (আলাইহিস্‌ সালাম) তাঁর প্রভুর কাছে নিজের ও স্বীয় বংশধরের নামায প্রতিষ্ঠার দু'আ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ربِّ اجعلني مقيم الصلاة ومن ذُرّيتي﴾ [سورة إبراهيم،الآية: ٤٠].

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। [সূরা ইব্‌রাহীম-আয়াত-৪০]

আর ইসমাঈল (আলাইহিস্‌ সালাম) তাঁর পরিবারকে নামায প্রতিষ্ঠার আদেশ করেছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة﴾ [سورة مريم، الآية: ٥٥].

অর্থ ঃ সে তাঁর পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত। [সূরা মারয়াম-আয়াত-৫৫]

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস্‌ সালাম) কে সম্বধন করে বলেন ঃ

﴿إنّني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري﴾ [سورة طه، الآية:١٤].

অর্থ ঃ আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। অতএব আমার ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর। [সূরা তাহা-আয়াত-১৪]

আল্লাহ তা'আলা নামায আদায়ের ব্যাপারে তাঁর নাবী ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) কে আদেশ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وجعلني مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً﴾ [سورة مريم،الآية:٣١].

অর্থ ঃ যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে। [সূরা মারয়াম-আয়াত- ৩১]

আল্লাহ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মি'রাজ ও ইস্রার রাত্রিতে আসমানে নামায ফরয করেছেন। আর নামায ফরয কালে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হালকা করে পাঁচ ওয়াক্ত করেছেন। ইহা আদায়ে পাঁচ ওয়াক্ত, কিন্তু ছুয়াবে পঞ্চাশ ওয়াক্ত।

والصلوات الخمس هي: - পাঁচ ওয়াক্ত নামায তা হলো ঃ ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ঈশা, এর উপর সকল মুসলমানদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

٣– دليل مشروعيتها:

৩- সালাত-নামায প্রবর্তনের দলীল ঃ

নামাযের প্রবর্তনতা প্রমাণিত হয়েছে একাধিক দলীল দ্বারা। নিম্নে তার কিছু বর্ণনা করা হল ঃ

প্রথমত ঃ কুরআন হতে ঃ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [سورة البقرة، الآية: ٤٣].

অর্থ ঃ তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর। [সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-৪৩]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً﴾ [سورة النساء، الآية: ١٠٣].

অর্থ ঃ নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু‘মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। [সূরা আন-নিসা-আয়াত-১০৩]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة﴾ [سورة البينة، الآية:٥].

অর্থ ঃ তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্টভাবে তাঁর ইবাদাত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে। [সূরা আল-বায়্যিনা-আয়াত-৫]

দ্বিতীয়ত ঃ হাদীস হতে ঃ

(১) ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হাদীস, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ

((بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)) [متفق عليه].

অর্থ ঃ ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা‘বুদ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দান করা। নামায প্রতিষ্ঠা করা। যাকাত প্রদান করা। বায়তুল্লাহ শরীফের হাজ্জ করা। রামাযানের রোযা রাখা। [বুখারী ও মুসলিম]

(২) উমার বিন খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীস, যাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ

((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله – ﷺ –، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً)) [رواه مسلم].

অর্থ ঃ ইসলাম হলো, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দেওয়া, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রামাযান মাসের রোযা রাখা, সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহ এর হাজ্জ করা।
[মুসলিম শরীফ]

(৩) ইব্‌নে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর হাদীস ঃ

((أن النبي – ﷺ – بعث معاذاً إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة)) [متفق عليه].

অর্থ ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুআয (রাযিআল্লাহু আনহু) কে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন এবং (তাঁকে) বল্‌লেন ঃ যে, তুমি তাদেরকে (আহলে কিতাবদেরকে) (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-) আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দানের দিকে

আহ্বান কর। যদি তারা এই দাও'আত গ্রহণ করে তোমার আনুগত্য করে তবে তুমি তাদেরকে জানাও যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। [বুখারী মুসলিম]

তৃতীয়ত ঃ ইজমা ঃ

সকল মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার উপর একমত হয়েছেন। আর ইহা ইসলামের ফরয সমূহের অন্যতম একটি ফরয।

٤– الحكمة في مشروعيتها:

৪- সালাত-নামায প্রবর্তনের পিছনে হিক্‌মাত ঃ

একাধিক হিক্‌মাত ও রহস্যকে সামনে রেখে নামায প্রবর্তন করা হয়েছে। নিম্নে তার কিছু ইঙ্গিত করা হলো ঃ

(১) আল্লাহ তা'আলার জন্য বান্দার দাসত্ব প্রকাশ করার লক্ষ্যে, সে তাঁর দাস, এই নামায আদায়ের দ্বারা মানুষ উবূদীয়াতের অনুভূতি লাভ করে, এবং সে সর্বদায় তাঁর সৃষ্টি কর্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে।

(২) এই নামায তার প্রতিষ্ঠা কারীকে আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন কারী ও সর্বদায় স্বরণ কারী করে রাখে।

(৩) নামায তার আদায় কারীকে নির্লজ্জ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে, আর ইহা বান্দাকে পাপ ভুল-ত্রুটি হতে পবিত্র করার মাধ্যম।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর হাদীসই তার প্রমাণ।

তিনি বলেন ঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((مثل الصلوات كمثل نهر جار يمر على باب أحدكم

يغتسل منه كل يوم خمس مرات))[رواه مسلم].

অর্থ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা ঐ প্রবহমান নদীর ন্যায় যা তোমাদের কারো দরজার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে, তথায় সে প্রতি দিন পাঁচ বার গোসল করে। [মুসলিম শরীফ]

(৪) নামায অন্তরের তৃপ্তি, আত্মার শান্তি, ও মুক্তি দানকারী ঐ বিপদ-আপদ হতে যা তাকে কলুষিত করে। এ জন্যই ইহা রাসূলের কুর্‌রাতুল আইন-নয়ন সিক্তকারী। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোন কঠিন কাজের সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি নামায আদায়ের দিকে ছুটে যেতেন। এমনকি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে থাকতেন ঃ

((يا بلال أرحنا بالصلاة)) [أخرجه أحمد].

অর্থ ঃ হে বিলাল ! নামাযের দ্বারা তুমি আমাকে শান্তি দাও। [আহ্‌মাদ]

٥- من تجب عليه الصلاة:

৫- কাদের উপর নামায ফরয ঃ

প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক জ্ঞানী মুসলিম ব্যক্তির উপর নামায ফরয। চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক। কাফিরের উপর নামায ফরয নয়। এর অর্থ-দুনিয়াতে সে এর আদিষ্ট নয়, কারণ তার কুফরী অবস্থায় তার পক্ষ থেকে ইহা শুদ্ধ হবেনা। তবে ইহা ছেড়ে দেওয়ার কারণে আখিরাতে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইহা আদায় করা তার জন্য সম্ভব ছিল, কিন্তু সে তা করে নাই।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين. و لم نك نطعم

المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين. حتى أتانا اليقينُ﴾ [سورة المدثر، الآية: ٤٢-٤٧].

অর্থ ঃ তোমাদেরকে কিসে সাকার নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে ? উহারা বলবে, আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, আমরা অভাবগ্রস্থকে আহার্য দান করতাম না, এবং আমরা আলোচনাকারীদের সহিত আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করতাম, আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমণ পর্যন্ত। [সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির-আয়াত-৪২-৪৭]

আর বাচ্চাদের উপরও ফরয নয়। কারণ সে মুকাল্লাফ-প্রাপ্ত বয়স্ক নয়। পাগলের উপরও ফরয নয়। ঋতু ও নিফাস গ্রস্থ মহিলাদের উপরও ফরয নয়। কারণ শরী'আত তাদের হতে এর বিধান তুলে নিয়েছে, ইহা আদায়ে বাঁধা প্রদান কারী নাপাকির কারণে।

বাচ্চা সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তার বয়স যখন সাত বছর হবে তখন তার অভিভাবকের উপর তাকে নামাযের আদেশ দেওয়া আবশ্যক। আর যখন তার বয়স দশ বছর হবে তখন নামায আদায় না করলে তার অভিভাবকের উপর তাকে প্রহার করা আবশ্যক। হাদীসে এর বর্ণনা এসেছে। যাতে সে তা আদায়ে অভ্যস্ত ও আগ্রহী হয়।

٦- حكم تارك الصلاة:

৬ - সালাত-নামায ত্যাগ কারীর বিধান ঃ

যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল সে ইসলাম হতে বহিস্কৃত হয়ে গেল এবং কুফরী করলো।

ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান হতে মুর্তাদ ব্যক্তিদের

অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার উপর যে

বিধি-বিধান ফরয করেছেন তা ছেড়ে দিয়ে সে তাঁর নাফারমানী করেছে। তাই তাকে তাওবার আদেশ দেওয়া হবে। যদি তাওবা করে ও নামায প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফিরে আসে তবে ভাল, অন্যথায় সে ইসলাম হতে মুর্তাদ হয়ে যাবে। তার গোসল, কাফন, জানাযার নামায পড়া, মুসলমানদের কবরে দাফন করা নিষেধ। কারণ সে তাদের (মুসলমানদের) অন্তর্ভুক্ত নয়।

٧– شروطها:

৭ - সালাতের-নামাযের শর্ত সমূহ ঃ

(১) ইসলাম-মুসলিম হওয়া।

(২) জ্ঞানবান হওয়া।

(৩) ভাল-মন্দ পার্থক্যের জ্ঞান থাকা।

(৪) নামাযের সময় উপস্থিত হওয়া।

(৫) নিয়াত করা।

(৬) ক্বিব্‌লা মুখী হওয়া।

(৭) সতর ঢাকা, পুরুষের সতর নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত। আর মহিলা তার সম্পূর্ণ শরীরই নামাযে সতর, তার মুখ ও হাতের তালুদ্বয় ছাড়া।

(৮) মুসল্লির কাপড়, শরীর ও নামায পড়ার স্থান হতে নাপাকি দূর করা।

(৯) হাদছ দূর করা, আর ইহা-নাপাকি হতে অযু গোসল করে পবিত্র হওয়াকে বুঝায়।

٨– أوقاتها:

৮ - সালাতের-নামাযের সময় ঃ

(১) যোহর নামাযের সময় ঃ সূর্য ঢলে যাওয়া হতে-অর্থাৎ মধ্য আকাশ হতে সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়া হতে

নিয়ে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত।

(২) আসর নামাযের সময় ঃ যোহর নামাযের সময় চলে যাওয়া হতে নিয়ে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুন হওয়া পর্যন্ত। আর তা হল সূর্য হলদে হওয়া সময় পর্যন্ত।

(৩) মাগরিব নামাযের সময় ঃ সূর্য ডুবা হতে নিয়ে লালিমা দূরীভূত হওয়া পর্যন্ত। আর তা হল ঐ লালটে ভাব যা পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবার পর প্রকাশিত হয়।

(৪) ঈশার নামাযের সময় ঃ মাগরিবের নামাযের সময় চলে যাওয়া হতে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত।

(৫) ফজর নামাযের সময় ঃ ফজরে সানী প্রকাশ হওয়া থেকে নিয়ে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত।

এর প্রমাণ আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীস, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ

((وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر، ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة---)) الحديث.[رواه مسلم].

অর্থ ঃ যোহরের সময় ঃ যখন সূর্য ঢলে যাবে, মানুষের ছায়া তার সমপরিমাণ হবে। আসরের নামাযের সময় হওয়া পর্যন্ত থাকবে। আর মাগরিবের নামাযের সময় সূর্য ডুবা হতে নিয়ে লালিমা পর্যন্ত। আর ঈশারের নামাযের সময় মাগরিবের নামাযের সময় চলে যাওয়া থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত। আর ফজরের নামাযের সময় ফজর প্রকাশিত হওয়া থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত, আর তখন (সূর্য

উদয়ের সময়) নামায পড়া হতে বিরত থাক। আল-হাদীস, [মুসলিম শরীফ]

٩– عدد ركعاتها:

৯- ফরয নামাযের রাকা'আতের সংখ্যা ঃ

ফরয নামাযের রাকা'আতের সংখ্যা সর্বমোট সতের রাকা'আত। নিম্নে তার তালিকা দেওয়া হল ঃ

(১) যোহর ঃ চার রাকা'আত।
(২) আসর ঃ চার রাকা'আত।
(৩) মাগরিব ঃ তিন রাকা'আত।
(৪) ঈশা ঃ চার রাকা'আত।
(৫) ফজর ঃ দু' রাকা'আত।

যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে এই রাকা'আতের সংখ্যায় বাড়ায় বা কমায় তবে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি তা ভুলবশতঃ হয় তবে তা সিজ্‌দায় সাহুর দ্বারা পূর্ণ করবে। এই সংখ্যা মুসাফির ব্যক্তির জন্য নয়। তার জন্য চার রাকা'আত বিশিষ্ঠ নামায গুলো দু' রাকা'আতে কছর করে পড়া মুস্তাহাব। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায তার নির্ধারিত সময়ে পড়া মুসলিম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যদি কোন শারয়ী অজর (যেমন-নিদ্রা, ভুলে যাওয়া, ভ্রমণে যাওয়া,) না থাকে। যে ব্যক্তি নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে যাবে বা ভুলে যাবে সে তা পড়ে নিবে যখন স্বরণ হবে।

١٠– فرائضها:

১০- নামাযের ফরয সমূহ ঃ

(১) সামর্থ্য থাকলে দাঁড়ানো।
(২) তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমাহ।
(৩) সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

(৪) রুকু‘ করা।

(৫) রুকু‘ হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

(৬) সাত অঙ্গের উপর সিজ্‌দা করা।

(৭) সিজ্‌দা হতে উঠা।

(৮) শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ পড়া।

(৯) তাশাহ্‌হুদ কালে বসা।

(১০) নামাযের এই রুক্‌ন গুলো সম্পাদনে স্থিরতা বজায় রাখা।

(১১) এই রুক্‌ন গুলো ধারাবাহিক ভাবে আদায় করা।

(১২) ডানে ও বামে দুই সালাম প্রদান করা বা সালাম ফিরানো।

١١- واجباتها:

১১- নামাযের ওয়াজিব সমূহ ঃ

নামাযের ওয়াজিব সমূহ আটটি ঃ

প্রথম ঃ তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার তাক্‌বীর ছাড়া নামাযে অন্যান্য তাক্‌বীর সমূহ।

দ্বিতীয় ঃ ((سمع الله لمن حمده)) (সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা) বলা। আর ইহা ইমাম ও একাকী নামায আদায় কারীর জন্য ওয়াজিব। তবে মুক্তাদী ইহা পাঠ করবে না।

তৃতীয় ঃ ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী নামায আদায় কারী সকলের উপর ((ربناولك الحمد)) (রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ) বলা ওয়াজিব।

চতুর্থ ঃ রুকুতে ((سبحان ربي العظيم)) (সুব্‌হা-না রাব্বিয়াল আজীম) বলা।

পঞ্চম ঃ সিজ্‌দায় ((سبحان ربي الأعلى)) (সুব্‌হা-না রাব্বিয়াল আ'লা) বলা।

ষষ্ঠ ঃ দু'সিজ্‌দার মাঝে ((رب غفر لي)) (রাব্বিগ ফিরলী) বলা।

সপ্তম ঃ প্রথম বৈঠকে তাহিয়্যাত পড়া, আর তা হলো ঃ

((التحيّات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله))

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস্ সালা-ওয়া-তু ওয়াত্ তাইয়্যেবা-তু, আস্‌সালা-মু আলাইকা আইউ হান্নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ। আস্‌সালা-মু আলাইনা-ওয়া আ'লা-ইবাদিল্লা-হিস্ স-লিহীন। আশ্‌হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াশ্ হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহ।
বা অনুরূপ প্রমাণিত তাহিয়্যাত পাঠ করা।

অষ্টম ঃ প্রথম বৈঠকের জন্য বসা। আর যারাই ইচ্ছাকৃত ভাবে এই ওয়াজিব সমূহের কোন একটি ওয়াজিব ছেড়ে দিবে তাদেরই নামায বাতিল হয়ে যাবে।

আর যে ব্যক্তি ইহা ছেড়ে দিবে অজ্ঞতা বা ভুল বঃশত সে সাহু সিজ্‌দা দিবে।

١٢– صلاة الجماعة:

১২ - জামা'আতে নামায ঃ

মাসজিদে জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া মুসলিম ব্যক্তির উপর আবশ্যক। এতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ছাওয়াব

অর্জন করতে পারবে।

একা নামায পড়ার চাইতে জামা‘আতে নামায পড়ার ছাওয়াব সাতাশ গুণ বেশী।

ইব্নে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) [متفق عليه].

অর্থ ঃ জামা‘আতে নামায পড়া, একা নামায পড়ার চাইতে সাতাশ গুণ (ছাওয়াব) বেশী। [বুখারী ও মুসলিম]

তবে মুসলিম রমণীর নিজ বাড়ীতে নামায পড়া জামা‘আতে নামায পড়ার চাইতে উত্তম।

١٣ – مبطلاتها:

১৩- নামায বাতিল (নষ্ট) কারী বিষয় সমূহ ঃ

নিম্নে বর্ণিত কর্ম সমূহের যে কোন একটি কর্ম সম্পাদনের দ্বারা নামায বাতিল হয়ে যাবে।

(১) ইচ্ছাকৃত পানাহার করা।

যে ব্যক্তি নামায অবস্থায় পানাহার করবে তার উপর ঐ নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক হওয়ার উপর উলামাগণের ইজমা রয়েছে।

(২) নামাযের মাসলাহাতের (কল্যাণ মূলক) বহির্ভূত এমন বিষয়ে ইচ্ছাকৃত কথা বলা।

এ ব্যাপারে যায়েদ বিন আরকাম (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন ঃ

((كنا نتكلم في الصلاة))

অর্থ ঃ আমরা নামাযে কথা বলতাম, আমাদের কেহ কেহ নামাযে তার পাশের সাথীর সাথে কথা বলতো।

এমতাস্থায় নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

﴿وقوموا لله قانتين﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٣٨].

অর্থ ঃ আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে। [সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-২৩৮]

((فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام))

[رواه البخاري و مسلم].

অর্থ ঃ অতঃপর আমরা চুপ থাকার আদেশ প্রাপ্ত হলাম। আর কথা বলা হতে নিষেধ প্রাপ্ত হলাম। [বুখারী ও মুসলিম]

এমনিভাবে ইজমা সংঘটিত হয়েছে ঐ ব্যক্তির নামায ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে যে, নামাযে তার মাসলাহাতের বহির্ভূত ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত কথা বলবে।

(৩) ইচ্ছাকৃত অনেক বেশী কাজ করা। আর অধিক কাজের পরিমাণ নির্ণয় করার মানদন্ড হল ঃ নামাযির দিকে দৃষ্টি পাত কারীর নিকট মনে হবে যে, সে নামাযের মাঝে নয়।

(৪) বিনা অজরে ইচ্ছাকৃত নামাযের কোন রুক্ন বা শর্ত ছেড়ে দেওয়া। যেমন বিনা অযুতে নামায পড়া, বা ক্বিবলা মুখী না হয়ে নামায পড়া। অর্থাৎ ক্বিবলা ছেড়ে অন্য দিক হয়ে নামায পড়া।

এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ বেদুঈনকে বলেছেন, যে তার নামায সুন্দর করে পড়তে পারে নাই।

((ارجع فصل فإنك لم تصلّ)) (অর্থ ঃ ফিরে যাও নামায পড়, কেননা তুমি নামায পড় নাই।)

(৫) নামাযে হাঁসা। কারণ হাঁসি দ্বারা নামায বাতিল হয়ে যাওয়ার উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

١٤- أوقات النهي عن الصلاة:

১৪- নামাযের নিষিদ্ধ সময় সমূহ ঃ

(১) ফজর নামাযের পর হতে নিয়ে সূর্য উঠা পর্যন্ত।

(২) ঠিক দুপুর সময়।

(৩) আসর নামাযের পর হতে সূর্য ডুবা পর্যন্ত।

এই সময় সমূহে নামায পড়া মাক্রুহ হওয়ার উপর দলীল হল উক্ববা বিন আমির (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীস, তিনি বলেন ঃ

((ثلاث ساعات كان رسول الله- ﷺ- ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضَّف الشمس للغروب حتى تغرب)) [رواه مسلم].

অর্থ ঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে তিন সময়ে নামায পড়তে ও আমাদের মৃত্যু ব্যক্তিদেরকে দাফন করতে নিষেধ করতেন।

(১) সূর্য স্পষ্ট ভাবে উদিত হওয়ার সময় হতে নিয়ে তা (উর্ধে উঠা) পর্যন্ত।

(২) ঠিক দুপুরে সূর্য উঁচু হওয়া হতে নিয়ে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত।

(৩) সুর্য অস্তমুখী হওয়া থেকে নিয়ে তা ডুবা পর্যন্ত। [মুসলিম]

আরো দলীল হলো আবু সাঈদ (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীস, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ

((لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)) [متفق عليه].

অর্থ ঃ আসরের নামাযের পর হতে নিয়ে সূর্য ডুবা পর্যন্ত, ফজরের নামাযের পর হতে নিয়ে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত কোন নামায নাই। [বুখারী ও মুসলিম]

١٥– إجمال صفة الصلاة:

১৫- নামাযের পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ

মুসলিম ব্যক্তির উপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণ করা ওয়াজিব।

নামায পড়ার পদ্ধতিও তাঁর অনুসরণের অন্তর্ভুক্ত।

কারণ তিনি বলেছেন ঃ

((صلوا كما رأيتموني أصلي)) [رواه البخاري].

অর্থ ঃ তোমরা নামায পড়, যে ভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ। [বুখারী মুসলিম]

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন, আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াতেন।

অন্তরে নামাযের নিয়্যাত করতেন, নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করার ব্যাপারে তাঁর পক্ষ হতে কোন হাদীস বর্ণিত হয় নাই।

আর (الله أكبر) "আল্লাহু আক্‌বার" বলে তাক্‌বীর দিতেন। এই তাক্‌বীরের সাথে তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন দুই কাঁধ সমপরিমাণ, আর কখনো কখনো দুই কানের লতি পর্যন্ত। তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর ধারণ করতেন।

নামায আরম্ভ করার দু'আ সমূহের যে কোন একটি দু'আ দিয়ে নামায শুরু করতেন তন্মধ্যে এটি।

(سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবা-

রাকাস্‌মুকা ওয়া তা'আ-লা যাদ্দুকা ওয়ালা-ইলা-হা গাইরুকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আপনার প্রশংসার সহিত পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার নাম মহিমান্বিত, আপনার সত্ত্বা অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত, আর আপনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই।

এই দু'আটি নামায আরম্ভ করার দু'আ সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তার পর সূরা ফাতিহার সাথে আরো একটি সূরা পড়তেন। তার পর হস্ত দ্বয় (প্রথম বারের ন্যায়) উত্তোলন করে তাক্‌বীর দিয়ে রুকুতে যেতেন, আর রুকুতে পিঠ সোজা করে রাখতেন, এমনকি যদি নিজের পিঠের উপর পানির পাত্র রাখা হত, তবে তা স্থীর থাকতো।

(سبحان ربي العظيم) "সুবহা-না রাব্বিয়াল আযীম" তিন বার পড়তেন।

অতঃপর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে মুখে (سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد) "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা ওয়া-লাকাল হাম্‌দ" বলে রুকু' হতে উঠে স্থীর হয়ে দাঁড়াতেন। অতঃপর তাক্‌বীর বলে সিজ্‌দা করতেন, সিজ্‌দা অবস্থায় নিজ হস্তদ্বয় নিজ বক্ষের পার্শ্ব দ্বয় হতে দূরে রাখতেন, এতে বগলের শুভ্র প্রকাশিত হয়ে যেত। তাঁর সাত অঙ্গ নাক সহ কপাল, তালুদ্বয়, হাঁটুদ্বয়, পাদ্বয়ের মাথা, মাটিতে রেখে সিজ্‌দা করতেন, (سبحان ربي الأعلى) "সুব্‌হা-না রাব্বিয়াল আ'লা" তিনবার বলতেন। অতঃপর ডান পা খাড়া রেখে সকল আঙ্গুলের মাথা ক্বিবলা মুখী করে আল্লাহু আকবার বলে বাম পার উপর বসতেন। আর এই বৈঠকে,

(رب اغفرلي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارفعني)

উচ্চারণ ঃ রাব্বিগ্‌ফিরলি ওয়ার হাম্‌নী ওয়াজাবরিনী ওয়ার

ফা‘নী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া আ‘ফিনী ওয়ার ফা‘নী।

এই দু‘আ তিনবার পড়তেন। অতঃপর আল্লাহু আক্‌বার বলতেন ও সিজ্‌দা করতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকা‘আতের জন্য তাক্‌বীর দিতেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক রাক‘আতে অনুরূপ করতেন। অতঃপর দু’ রাকা‘আতের পর যখন প্রথম বৈঠকের জন্য বসতেন তখন বলতেন,

((التحيّات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله))

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস্ সালা-ওয়া-তু ওয়াত্ তাইয়্যেবা-তু, আস্‌সালা-মু আলাইকা আইউ হান্নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ। আস্‌সালা-মু আলাইনা-ওয়া আ‘লা-ইবাদিল্লা-হিস্ স-লিহীন। আশ্‌হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াশ্ হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহ।

তার পর তাকবীর দিয়ে দন্ডায়মান হয়ে দু’ হাত উত্তোলন করতেন। (তৃতীয় রাকা‘আতের জন্য) আর ইহা নামাযের চতুর্থ স্থান যেখানে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হস্তদ্বয় উত্তোলন করেছেন। তার পর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন শেষ বৈঠকের জন্য তা হলো মাগরিবের তৃতীয় রাক‘আতের শেষে বা যোহর, আসর, ও ঈশার চতুর্থ রাক‘আতের শেষে-বসতেন তখন তাওয়ার্‌রুক করে বসতেন।

বাম পা ডান পায়ের নলীর নীচ দিয়ে বের করে দিয়ে ডান পা কিব্‌লা মুখী অবস্থায় খাড়া রেখে নিতম্বের উপর বসতেন। হাতের

সমস্ত আঙ্গুল বন্ধ রাখতেন, শুধু শাহাদাত আঙ্গুল তার প্রতি দৃষ্টি রেখে ইশারা বা নাড়ানোর জন্য খোলা রাখতেন। অতঃপর যখন তাশাহুদ শেষ করতেন তখন ডান দিকে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ও বাম দিকে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরাতেন। এমনকি তাঁর গালের শুভ্রতা প্রকাশ পেয়ে যেতে।

নামাযের এই পদ্ধতি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম) এর অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

ইহা নামাযের বিধান সমূহের কিছু বিধান যার উপর কর্মের সঠিকতা নির্ভর করে, আর তার (বান্দার) যদি নামায ঠিক হয়ে যায় তবে তার সকল কর্ম ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি নামায নষ্ট-ফাসেদ হয়ে যায় তবে তার সকল কর্ম নষ্ট-ফাসেদ হয়ে যাবে। আর কিয়ামাত দিবসে সর্ব প্রথম বান্দার নামাযের হিসাব নেওয়া হবে যদি সে ইহা পুরোপুরি ভাবে আদায় করে তবে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে উত্তীর্ণ হবে। আর যদি সে ইহা হতে কিছু ছেড়ে দেয় তবে সে ধ্বংস হবে। আর নামায (মানুষকে) বেহায়াপানা ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে। আর ইহা মানব আত্মার রোগের চিকিৎসা যাতে ইহা (আত্মা) হীন স্বভাব হতে পরিস্কার পরিছন্ন হতে পারে।

الركن الثالث: الزكاة

তৃতীয় রুক্‌ন ঃ যাকাত ।

١– تعريفها:

১- যাকাতের সংজ্ঞা ঃ

الزكاة لغة:- যাকাতের শাব্দিক অর্থ ঃ বৃদ্ধি পাওয়া, বেশী হওয়া। কখনো প্রশংসা, পবিত্র করন ও সংশোধন এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর মালের যে অংশ বের করা হয় তাকে যাকাত বলে। কারণ এর দ্বারা বরকতের মাধ্যমে মাল বৃদ্ধি পায়, আর ক্ষমার মাধ্যমে ব্যক্তিকে পবিত্র করা হয়।

واصطلاحاً: - যাকাতের পারিভাষিক অর্থ ঃ নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ঠ গোষ্টির জন্য নির্ধারিত মালে অত্যাবশকীয় হক্ব বের করা।

٢– مكانتها في الإسلام:

২- ইসলামে যাকাতের স্থান ঃ

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ।

আল-কুরআনে বহু স্থানে সালাতের সাথে যাকাতের আলোচনা হয়েছে।

যেমন-আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

﴿وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة﴾[سورة البقرة، الآية: ٤٣].

অর্থ ঃ তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর।

[সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-৪৩]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزّكاة﴾[سورة البينة، الآية: ٥].

অর্থ ঃ এবং (তারা আদিষ্ট হয়েছিল) সালাত কায়েম করতে,

এবং যাকাত প্রদান করতে। [সূরা আল-বায়্যিনাহ্-আয়াত-৫]

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ

((بني الإسلام على خمس)) وذكر منها ((إيتاء الزكاة))

[متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما].

অর্থ ঃ ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে যাকাত আদায় করা অন্যতম একটি রুক্ন। [এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম একত্রিত ভাবে ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেছেন]

আল্লাহ মানব জাতির আত্মাকে কৃপণতা, বখীলতা ও লোভ-লালসা হতে পবিত্র করার জন্য, ফকীর-মিসকীন ও অভাবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করার জন্য, মালকে পবিত্র ও বৃদ্ধি করার জন্য, তথায় বরকত অবতীর্ণ করার জন্য, তাকে বিপদ-আপদ ও বিপর্যয় হতে রক্ষা করার জন্য এবং জাতির জীবন ও সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য যাকাত প্রবর্তন করেছেন।

আল্লাহ তাঁর কিতাবে যাকাত গ্রহণের হিক্মাত উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

﴿خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها﴾[سورة التوبة، الآية: ١٠٣].

অর্থ ঃ তুমি তাদের সম্পদ হতে সাদ্কা (যাকাত) গ্রহণ কর। ইহার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র এবং আত্মশুদ্ধি কর। [সূরা আত্তাওবাহ-আয়াত-১০৩]

٣- حكمها:

৩- যাকাতের বিধান ঃ

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি মালের শর্তানুযায়ী নিসাবের মালিক হলে তার উপর যাকাত ফরয। এমনকি বাচ্চা ও পাগলদের পক্ষ হতে তাদের অভিভাবক তাদের মালের যাকাত আদায় করবেন। যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে ইচ্ছাকৃত ভাবে এর ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি বখীলতা ও অলসতা করে যাকাত দিবেনা এর জন্য তাকে ফাসেক ও কাবীরাহ গুনাহে লিপ্ত বলে গণ্য করা হবে। আর তার যদি এ অবস্থায় মৃত্যু হয় তবে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীনে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾

[سورة النساء، الآية: ٤٨].

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্য যে কোন অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। [সূরা আন-নিসা-আয়াত-৪৮]

তার কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে, আর হারামে পতিত হওয়ায় তাকে তা'জির (সাময়ীক শাস্তি) করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা যাকাত অস্বীকার কারীকে নিম্নের বাণী দ্বারা ধমকী দিয়েছেন ঃ

﴿والّذين يكترون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنّم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم

فذوقوا ما كنتم تكنزون﴾[سورة التوبة، الآية:٣٤-٣٥].

অর্থ ঃ আর যারা সোনা রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ প্রদান করুন। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। (এবং সেদিন বলা হবে) ইহাই তা যা তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে। [সূরা আত্তাওবাহ-আয়াত-৩৪-৩৫]

আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((ما من صاحب كنـــز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه وجبنه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)) [الحديث متفق عليه وهذا لفظ مسلم].

অর্থ ঃ মালের মালিক যাকাত আদায় না করলে সে মালকে জাহান্নামের আগুনে গরম করে তক্তা বানানো হবে, তারপর তা দিয়ে তার পার্শ্বদ্বয় ও ললাটে দাগ দিতে থাকবে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করা পর্যন্ত ঐ দিনে, যে দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। তারপর সে জান্নাতী হলে জান্নাতের পথ আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামের পথ দেখবে। [হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম একত্রিত ভাবে বর্ণনা করেছেন, তবে শব্দগুলো মুসলিমের]

٤– شروط وجوبها:

৪- যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত ঃ

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে ঃ

প্রথম শর্ত ঃ ইসলাম-কাফেরের উপর যাকাত ফরয নয়।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ স্বাধীনতা, অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট দাসের মালে যাকাত ওয়াজিব নয়। অনুরূপ মুকাতাবের (চুক্তি বদ্ধ কৃতদাস) মালের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কারণ তার উপর এক দেরহাম আদায় অবশিষ্ট থাকলেও সে দাস হিসাবে গণ্য।

তৃতীয় শর্ত ঃ নিসাবের মালিক হওয়া, আর যদি মাল নিসাব পূর্ণ না হয় তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব নয়।

চতুর্থ শর্ত ঃ মালের পূর্ণ মালিক হওয়া, তাই মুকাতাবের দাঈন বা ঋণে যাকাত ফরয নয়। বন্টনের পূর্বে মুযারিব অর্থাৎ মুযারাবা (যৌথ ব্যবসায়) লেন দেনে অংশ গ্রহণ কারীর লভ্যাংশে যাকাত ফরয নয়। অসচ্ছল ব্যক্তির উপর যে ঋণ রয়েছে তা অর্জীত না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত ওয়াজিব নয়। আর যে মাল কল্যাণ ও পূণ্যের পথে যেমন মুজাহিদের, মাসজিদের, বসবাসের ও অনুরূপ খাতে ওয়াক্‌ফ তাতে যাকাত ওয়াজিব নয়।

পঞ্চম শর্ত ঃ এক বছর অতিবাহিত হওয়া। এক বছর অতিবাহিত না হওয়ার আগ পর্যন্ত কোন মালেই যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে জমি হতে উৎপন্ন ফসল ও ফল মূল ছাড়া। কারণ তার যাকাত ওয়াজিব হবে তা কাটার ও পাড়ার সময়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وآتوا حقّه يوم حصاده﴾[سورة الأنعام، الآية: ١٤١].

অর্থ ঃ এবং তার (ফসলের) হক্ব আদায় কর তা কাটার

দিবসে। [সূরা আন-আ'ম-আয়াত-১৪১]

আর খনিজ সম্পদ ও রিকায-(মাটিতে পুঁতে রাখা) সম্পদের যাকাতের বিধান জমি হতে উৎপন্ন ফসল ও ফলের যাকাতের বিধানের ন্যায় কারণ তা জমি হতে সংগৃহিত মাল।

গৃহপালিত পশুর এবং ব্যবসার লভ্যাংশের উপর বছর অতিবাহিত হওয়া গণ্য হবে মূলের উপর বছর অতিবাহিত হওয়ার ন্যায়। তাই গৃহপালিত পশুর উৎপাদিত ও ব্যবসার লভ্যাংশকে তার মূলধনের সাথে মিলাবে এবং নিসাব পূর্ণ হলে তার যাকাত দিবে।

আর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানবান হওয়া শর্ত নয়।

তাই অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট বাচ্চা ও পাগলের মালে যাকাত ওয়াজিব হবে।

٥- الأموال الزكوية:

৫- যাকাত ওয়াজিব যোগ্য সম্পদ ঃ

পাঁচ শ্রেণীর মালে যাকাত ওয়াজিব হয়।

প্রথম ঃ সোনা, রূপার ও অনুরূপভাবে তার স্থলাভিসিক্ত প্রচলিত কাগজের মুদ্রার উপর যাকাত ওয়াজিব ঃ

আর তাতে যাকাতের পরিমাণ হলো রুবু'ল উ'শর (এক চল্লিশমাংশ)। আর রুবু'ল উ'শরের পরিমাণ হলো শতকরা আড়াই ভাগ। এক বছর অতিবাহিত ও নিসাব পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

সোনার নিসাবের পরিমাণ হলো বিশ মিছকাল। আর এক মিছকালের ওজন (৪.২৫) গ্রাম।

অতএব সোনার নিসাব হলো (৮৫) গ্রাম।

রূপার নিসাবের পরিমাণ হলো দু'শত দিরহাম। আর এক

দিরহামের পরিমাণ হলো (২.৯৭৫)। সুতরাং রূপার নিসাব হলো (৫৯৫) গ্রাম।

তবে বর্তমান কাগজের মুদ্রা তার নিসাবের পরিমাণ হলো ঃ এক বছর অতিবাহিত কালে যাকাত বের করার সময় তার মূল্য পঁচাশি (৮৫) গ্রাম সোনার অথবা পাঁচশত পঁচানব্বই (৫৯৫) গ্রাম রূপার সমান হতে হবে। এই জন্য সোনা ও রূপার নিসাবের পরিমাণের তুলনায় বর্তমান কাগজের মুদ্রার নিসাব তার দর-মান কম-বেশী হওয়ার কারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

তাই কারও কাছে তার যে কাগজের মুদ্রা রয়েছে তা দিয়ে যদি সে পূর্বে বর্ণিত সোনা বা রূপার পরিমাণে যে কোন একটি পরিমাণ ক্রয় করতে সক্ষম হয় বা তার চাইতে বেশী হয় তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে, তার নাম যাই হোক না কেন রিয়াল হোক বা দিনার হোক বা ফারাঙ্ক হোক বা ডলার হোক বা অন্য আরো যে কোন নাম হোক। আর তার গুনাগুণ যাই হোক না কেন কাগজের মুদ্রা হোক বা খনিজ পদার্থ হোক, বা অন্য আরো কিছু হোক। আরো প্রসিদ্ধ কথা হলে যে, মুদ্রার দর কোন কোন সময় পরিবর্তন হয়। তাই তাতে যখন যাকাত ওয়াজিব হবে তখন যাকাত দাতার তার মূল্যের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত হবে। আর তা হল তাতে এক বছর অতিবাহিত হওয়া। আর যদি কোন মালে নিসাবের চাইতে বেশী হয় তবে সেই মাল থেকে নিসাব অনুসারে যাকাত বের করতে হবে ।

এর দলীল হলো আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীস।

তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد

فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول))[رواه أبو داود وهو حديث حسن].

অর্থ ঃ তুমি যদি দুই শত দিরহামের মালিক হও, আর তাতে যদি এক বছর অতিবাহিত হয়। তবে তা যাকাতের নির্ধারিত পরিমাণ হবে পাঁচ দিরহাম। যদি তোমার নিকট বিশ দিনার থাকে, আর তা এক বছর অতিবাহিত হয়, তবে তাতে অর্ধ দিনার যাকাত দিতে হবে। আর এর চাইতে কম মালে যাকাত ওয়াজিব হবে না। সুতরাং এই পরিমাণের বেশি হলে এই অনুপাতে যাকাত দিতে হবে। আর কোন মালেই যাকাত ওয়াজিব হবে না এক বছর অতিবাহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত। [হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, আর হাদীসটি হাসান]

অলঙ্কার-গহনা যদি জমা ও ভাড়া দেওয়ার জন্য তৈরী করে রাখা হয় তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। এতে কোন দ্বিমত নেই। আর তা যদি ব্যবহারের জন্য তৈরী করে রাখা হয় তবে তাতে বিদ্যানগণের দু'মতের গ্রহণযোগ্য মতে যাকাত ওয়াজিব হবে। কারণ সোনা রূপার যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে যে সকল দলীল বর্ণিত হয়েছে তা আম-ব্যাপক।

ইমাম আবু দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী আমর বিন শু'আইব তার পিতা হতে, পিতা তার দাদা (রাযিআল্লাহ আনহুম) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ

((أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها وفي يدي بنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا ؟ قالت: لا، قال:(أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار) فخلعتهما وألقتهما إلى النبي ﷺ، وقالت: هما لله ولرسوله)).

অর্থ ঃ জনৈক মহিলা তার মেয়ে সহ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আসলো। তার মেয়ের দু' হাতে দু'টি সোনার মোটা চুরি ছিল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বল্‌লেন তুমি কি এর যাকাত দাও ? সে বল্‌ল না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন তুমি কি ভাল বাস যে এর বিনিময়ে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তোমাকে আগুনের দু'টি চুরি পরান ? সাথে সাথে মহিলাটি চুরি দু'টি খুলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে রাখল এবং বল্‌ল ঃ এই চুরি দু'টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।

আবু দাউদ ও অন্যান্যরা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ

((دخل عليّ رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهنّ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار)).

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নিকট প্রবেশ করে আমার হাতে অনেকগুলো রূপার আংটি দেখে বল্‌লেন হে আয়েশা এগুলো কি ? অতঃপর আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বল্‌লেন হে আল্লাহর রাসূল এগুলো আমি তৈরী করেছি আপনার সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য। তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন তুমি কি এগুলোর যাকাত প্রদান কর ? আমি বল্‌লাম না অথবা আল্লাহ যদি চান। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন ঃ এর যাকাত না দেওয়াটাই তোমার জাহান্নামে যাওয়ার জ্যন যথেষ্ঠ।

খনিজ জাত ধাতুব দ্রব্যের ও সোনা ছাড়া তৈরী-অলঙ্কার যেমন- মুক্তা, মতি ইত্যাদিতে কোন বিদ্যানগণের নিকটেও যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে যদি ব্যবসার জন্য তৈরী করা হয় তাহলে ব্যবসার জন্য তৈরী মালের যাকাতের ন্যায় যাকাত দিতে হবে।

দ্বিতীয় ঃ চতুস্পদ জন্তু ঃ

আর তা হলো, উট, গরু, ছাগল। আর ইহাতে যাকাত ওয়াজিব হবে যখন ইহা সায়েমা হবে। সায়েমা ঐ সকল পশু যা বছরের অধিকাংশ দিনগুলো (মালিকের কাছে) লালিত-পালিত হয়, কারণ অধিকাংশের জন্য সকলের যে বিধান সে বিধান প্রযোজ্য।

আর এর দলীল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী ঃ

((في كل إبل سائمة صدقة)) [رواه أحمد وأبو داود والنسائي].

অর্থ ঃ প্রত্যেক সায়েমা উটে যাকাত রয়েছে। [হাদীসটি আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আরো বাণী হলো ঃ

((في صدقة الغنم في سائمتها)) [رواه البخاري].

অর্থ ঃ ছাগলের যাকাত কেবল মাত্র সায়েমা ছাগলে। [বুখারী] যখন নিসাব পূর্ণ হবে ও এক বছর অতিবাহিত হবে।

গৃহপালিত পশুর যাকাতের তালিকা ঃ

শ্রেণী	নিসাবের পরিমাণ, হতে – পর্যন্ত	নির্ধারিত পরিমাণ ঃ
উট	৫-------------৯	একটি ছাগল
	১০-----------১৪	দু'টি ছাগল
	১৫-----------১৯	তিনটি ছাগল
	২০-----------২৪	চারটি ছাগল
	২৫-----------৩৫	এক বছরের একটি মাদা উট
	৩৬-----------৪৫	দু'বছরের একটি মাদা উট
	৪৬-----------৬০	তিন বছরের একটি মাদা উট
	৬১-----------৭৫	চার বছরের একটি মাদা উট
	৭৬-----------৯০	দু'বছরের দু'টি মাদা উট
	৯১----------১২০	তিন বছরের দু'টি মাদা উট

আর যদি উটের সংখ্যা ১২০টির উপর হয় তাহলে প্রতি ৪০টিতে দু'বছরের একটি মাদা উট। আর প্রতি ৫০টিতে তিন বছরের একটি মাদা উট দিতে হবে ইহা অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট।

গৃহপালিত পশুর যাকাতের তালিকা ঃ

শ্রেণী	নিসাবের পরিমাণ, হতে - পর্যন্ত	নির্ধারিত পরিমাণ
গরু	৩০-----------৩৯	এক বছরের একটি বাছুর বা বক্না দিতে হবে
	৪০-----------৫৯	দু'বছরের একটি বক্না দিতে হবে
	৬০-----------৬৯	এক বছরের দু'টি বাছুর দিতে হবে
	৭০-----------৭৯	এক বছরের একটি বাছুর এবং দু'বছরের একটি বক্না দিতে হবে।

আর যদি গরুর সংখ্যা ৭৯টির উপর হয় তাহলে প্রতি ৩০টিতে একবছরের একটি বাছুর, আর প্রতি ৪০টিতে একবছরের একটি বক্না দিতে হবে।

শ্রণী	নিসাবের পরিমাণ, হতে – পর্যন্ত	নির্ধারিত পরিমাণ
ছাগল	৪০----------১২০	একটি ছাগল দিতে হবে।
	১২১---------২০০	দু'টি ছাগল দিতে হবে।
	২০১---------৩০০	তিনটি ছাগল দিতে হবে।

আর যদি ছাগলের সংখ্যা ৩০০ শত এর বেশী হয় তাহলে প্রতি ১০০ শতে একটি ছাগল দিতে হবে।
আর এর দলীল হলো ঃ আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীস ঃ

((أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:

بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وّعشرين إلى خمسٍ وّثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أنثى فإذا بلغت ستة وّثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها

جذعة، فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها)) الحديث،[رواه البخاري].

অর্থ ঃ আবু বকর (রাযিআল্লাহু আনহু) যখন তাঁকে (আনাস রাযিআল্লাহু আনহু কে) বাহরাইনে গভর্নর হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, তখন তার নিকট এই পত্র লিখেছিলেন ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরয সাদ্‌কা (যাকাত) সম্পর্কে মুসলমানদের উপর যা নির্ধারিণ করেছেন এবং সে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যা আদেশ করেছেন তা এ কাজেই মুসলিমদের যার কাছেই (যাকাত) বিধি অনুসারে এটা চাওয়া হবে সে যেন তা প্রদান করে। কিন্তু যার নিকট তার অধিক (অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক) দাবী করা হবে সে যেন (অতিরিক্ত) প্রদান না করে। চব্বিশটি উট কিংবা তার কম হলে ছাগল দিতে হবে-(এ নিয়মে যে,) প্রতি পাঁচটি উটের জন্য একটি ছাগল। উটের সংখ্যা যখন পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হবে তখন তাতে দু' বছরের একটি মাদা উট দিতে হবে। যখন তা ছত্রিশ থেকে

পঁয়তাল্লিশে পৌঁছবে তখন তাতে তিন বছরের একটি মাদা উট দিতে হবে। যখন তা ছিচল্লিশ থেকে ষাটে পৌঁছবে তখন তাতে গর্ভধারণের উপযোগিনী একটি চার বছরের মাদা উট দিতে হবে। যখন তা (উটের সংখ্যা) একষট্টি থেকে পঁচাত্তর হবে তখন তাতে পাঁচ বছরের একটি মাদা উট দিতে হবে। যখন তা ছিয়াত্তর থেকে নব্বই হবে তখন তাতে দু'টি তিন বছরের মাদা উট দিতে হবে। যখন তা একানব্বই থেকে একশ বিশ হবে তখন তাতে গর্ভধারণের উপযোগিনী দু'টি চার বছরের মাদা উট দিতে হবে। যখন উটের সংখ্যা একশ বিশের ঊর্ধে হবে তখন প্রতি চল্লিশটির জন্য একটি তিন বছরের মাদা উট এবং প্রতি পঞ্চাশটি উটের জন্য একটি চার বছরের মাদা উট দিতে হবে। যদি কাহারো নিকট মাত্র চারটি উট থাকে তবে তাতে যাকাত দিতে হবে না। হাঁ যদি মালিক স্বেচ্ছায় (নফল সাদ্‌কা হিসেবে) কিছু প্রদান করে (তবে তাতে ক্ষতি নেই)। কিন্তু যখন উটের সংখ্যা পাঁচ হবে তখন তাতে একটি ছাগল দিতে হবে। যেসব ছাগল চড়ে খায় (অর্থাৎ বিচরণ করে বেড়ায়) তাতে যাকাত দিতে হবে। চল্লিশ থেকে একশ বিশটি পর্যন্ত একটি ছাগল, একশ বিশটির অধিক হলে দু'শ পর্যন্ত দু'টি ছাগল, দু'শতের অধিক হলে তিনশ পর্যন্ত তিনটি ছাগল এবং যদি তিনশ এর অধিক হয় তবে প্রতি একশ তের জন্য একটি ছাগল দিতে হবে। চড়ে খায় এমন ছাগলের সংখ্যা যদি কাহারো নিকট চল্লিশের একটিও কম থাকে তবে তাতে যাকাত দিতে হবে না। হাঁ, মালিক যদি স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে (ক্ষতি নেই)। আল-হাদীস, [বুখারী]

আরো দলীল হলো ঃ মু'আয বিন জাবাল (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীস ঃ

((أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين

بقرة تبيعاً أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة)) [رواه أحمد وأصحاب السنن].

অর্থ ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে (মু'আযকে) ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন। প্রতি ত্রিশটি গরু হতে একটি বাছুর বা বক্না গ্রহণের আদেশ দিয়েছিলেন। আর প্রতি চল্লিশটি গরু হতে দু'বছরের একটি বক্না গ্রহণের আদেশ দিয়েছিলেন। [হাদীসটি আহমাদ ও আসহাবুস্ সুনান বর্ণনা করেছেন]

যখন নিসাব গণনা করবে তখন গৃহপালিত পশুর উৎপন্ন বস্তু তার আসলের সাথে মিলাবে। আর যদি তা ছাড়া গৃহপালিত পশুর নিসাব পূর্ণ না হয় তাহলে নিসাব পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, তার দ্বারা একবছর অতিবাহিত গণ্য করা হবে।

আর যদি চতুস্পদ জন্তু ব্যবসার জন্য লালিত-পালিত হয় তাহলে ব্যবসার মালের যাকাতের ন্যায় তার যাকাত দিতে হবে। আর যদি তা ব্যবহারের বা উন্নয়নের জন্য লালিত-পালিত হয়, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ (এই ব্যাপারে) আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) [أخرجه البخاري ومسلم].

অর্থ ঃ মুসলিম ব্যক্তির দাসের ও ঘোড়ার উপর যাকাত নেই। [হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

তিন ঃ ফসল ও ফলাফল ঃ

অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট উৎপাদিত ফসলে যাকাত ওয়াজিব হবে নিসাব পূর্ণ হলে। আর তাদের নিকট তার নিসাব হল পাঁচ ওয়াসাক।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ

((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) [متفق عليه].

অর্থ ঃ পাঁচ আওসুক এর কমে যাকাত ফরয নয়। [হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন]

আর এক وسق (ওয়াসাক) সমান ষাট স্বা'আ। সুতরাং নিসাবের পরিমাণ হলো তিনশত স্বা'আ। আর ভাল গমের দ্বারা নিসাবের পরিমাণ হবে ছয়শত বায়ান্ন কিলো ও আটশত গ্রাম।

ফসল ও ফলের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য একবছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়।

কারণ এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার বাণী রয়েছে ঃ

﴿وآتوا حقّه يوم حصاده﴾ [سورة الأنعام، الآية: ١٤١].

অর্থ ঃ এবং তার (ফসলের) হক্ব আদায় কর তা কাটার দিবসে। [সূরা আন-আ'ম-আয়াত-১৪১]

যে সকল ফসল বিনা পরিশ্রমে পানি সরবরাহ হয়ে উৎপন্ন হয়েছে তাতে যাকাতের নির্ধারিত পরিমাণ হলো দশ ভাগের এক ভাগ, আর যে সকল ফসল পরিশ্রমের দ্বারা পানি সরবরাহ হয়ে উৎপন্ন হয়েছে তাতে নির্ধারিত পরিমাণ হলো ঃ বিশ ভাগের এক ভাগ।

কারণ এ ব্যাপারে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস রয়েছে ঃ

((فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر)) [أخرجه البخاري].

অর্থ ঃ যেসব ভূমি বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা অথবা নদ-নদীর

পানি দ্বারা স্বাভাবিকভাবে আবাদ হয়, তাতে উ'শর (এক দশমাংশ) ওয়াজিব হবে। আর যে সব ভূমিতে পানি সেচ করতে হয় তাতে বিশ ভাগের একভাগ ওয়াজিব হবে (এটাই ফসলের যাকাত)। [হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন]

চার ঃ ব্যবসা সামগ্রী ঃ

মুসলিম ব্যক্তি ব্যবসার জন্য যে মাল প্রস্তুত করেছে তাকে ব্যবসা সামগ্রী বলে। তা যে কোন শ্রেণীর মাল হোক না কেন। যাকাতের সাধারণ সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। নিসাব পূর্ণ হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। ব্যবসা সামগ্রীর মূল্য সোনা ও রূপার নিসাবের সমান হওয়া গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর তা হলো বিশ মিছকাল যা পঁচাশি গ্রাম সোনার সমতুল্য। অথবা দু'শত দিরহাম যা পাঁচশত পঁচানব্বই গ্রাম রূপার সমতুল্য।

সোনা ও রূপা হতে ব্যবসা সামগ্রীর পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে ফকীরদের অংশের প্রতি লক্ষ্য রেখে। যখন তাতে এক বছর অতিবাহিত হবে তখন ক্রয় মূল্য গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যাকাত বের করার সময়ে বাজার মূল্য গ্রহণযোগ্য হবে।

পূর্ণ মূল্যের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত বের করা ওয়াজিব হবে। ব্যবসার লভ্যাংশ তার আসল মালের সাথে মিলাবে, যদি নিসাব পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে তার যাকাত দানে নতুন বছরের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। আর যদি লভ্যাংশ ছাড়া আসল মালে নিসাব পূর্ণ না হয় তাহলে নিসাব পূর্ণ হওয়ার সময় হতে বছর শুরু/গণ্য হবে।

পাঁচ ঃ খনিজ সম্পদ ও রিকায ঃ যা মাটিতে পুঁতে রাখা মাল ঃ

(ক) খনিজ সম্পদ ঃ

খনিজ সম্পদ ঐ সকল বস্তু যা জমি হতে নির্গত হয়, তথায় জন্ম নেয় যা জমির মূল্যবান উৎপন্ন নয়, এবং উদ্ভিদও নয়, যেমন সোনা-রূপা, লৌহ, তামা, ইয়াকুত পাথর ও পেট্রোল ইত্যাদি। আর তাতে যাকাত ওয়াজিব।

কারণ আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক বাণী রয়েছে ঃ

﴿يا أيّها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم ومّما أخرجنا لكم من الأرض﴾ [سورة البقرة، الآية:٧ ٢٦].

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমরা তোমাদের জন্য জমি হতে যা উৎপন্ন করেছি তার মধ্যে যা পূত-পবিত্র তা তোমরা ব্যয় কর। [সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত- ২৬৭]

খনিজ সম্পদ যে আল্লাহ তা'আলা জমি হতে নির্গত করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট খনিজ সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাব পূর্ণ হওয়া শর্ত। আর খনিজ সম্পদে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। সোনা-রূপার যাকাতের পরিমাণের উপর ক্বিয়াস বা তুলনা করে। তাতে এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। তা যখন সংগ্রহ হবে তখনই তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

(খ) রিকায-মাটিতে পুঁতে রাখা ধনসম্পদ ঃ

জাহিলি যুগের মাটিগর্ভে-গচ্ছিত সম্পদ, অথবা পূর্ববর্তী কাফির সম্প্রদায়ের সম্পদ যদিও জাহিলি না হয় আর তার উপর বা তার কিছুর উপর কুফুরের নির্দশন হয় যেমন তাদের নাম, তাদের রাজাদের নাম, তাদের ছবি, তাদের পৃষ্টদেশ ও শুধু তাদের প্রতিমার

বক্ষদেশ থাকে (তা হলেও তা রিকায হবে)। আর যদি তার উপর বা তার কিছুর উপর মুসলমানদের নিদর্শন থাকে, যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম বা মুসলমানদের খলীফাদের কারও নাম বা কুরআন কারীমের আয়াত। তা হলে তা (লুক্বাতা)-পথে পড়ে থাকা বস্তু হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি তাতে কোন নির্দশন না থাকে, যেমন পাত্র, স্ত্রীলোকের অলঙ্কার সাজ-সজ্জা, স্বর্ণের বিস্কুট তা হলেও তা লুক্বাতা হবে, আর তা প্রচার করার আগ পর্যন্ত কেহই তার মালিক হবে না। কারণ তা হল মুসলিম ব্যক্তির মাল, আর তা হতে তার মালিকানা নষ্ট হয়ে যায় নাই। আর রিকাযে (মাটি গর্ভে গচ্ছিত রাখা সম্পদে) এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ওয়াজিব।

কারণ আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((وفي الركاز الخمس)).

অর্থ ঃ আর রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হবে।

অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট রিকায, কম হোক বা বেশী হোক তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। তাদের নিকট তা বন্টনের খাত হল ফাই (যুদ্ধ বিহিন অমুসলিম শত্রুর সম্পদ যা মুসলমানরা অর্জন করে) বন্টনের খাত। যে ব্যক্তি তা পাবে সে বাকী রিকাযের মালিক হবে, এতে বিদ্যানগণের কোন মতনৈক্য নেই। কারণ উমার (রাযিআল্লাহু আনহু) অবশিষ্ট রিকায তার প্রাপককে দিয়েছিলেন।

٦- مصارف الزكاة:

৬ - যাকাত বন্টনের খাত সমূহ ঃ

আট শ্রেণীর লোক যাকাত পাওয়ার হক্বদার। তার নিম্নে তালিকা প্রদত্ত হলো ঃ

প্রথমত ঃ ফকীর ঃ আর তারা হলেন ঐ সকল লোক যাদের কাছে জীবন যাপনের কোন কিছুই নেই, অথবা কিছুটা আছে, তাদেরকে পূর্ণ বছরের জন্য যথেষ্ট হয় এই পরিমাণ যাকাত থেকে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ মিসকীন ঃ যাদের নিকট অর্ধবছর বা অর্ধবছরের চেয়ে কিছু বেশী সময়ের খাবার রয়েছে। এই অর্থে মিসকীনের অবস্থা ফকীরের অবস্থার চেয়ে ভাল। তাদেরকে তাদের পুরা বছরের জন্য যথেষ্ট হয় এই পরিমাণ যাকাত দেওয়া হবে।

তৃতীয়ত ঃ যাকাত আদায়কারী ঃ আর তারা হলেন, ঐ সমস্ত কর্মচারী যারা যাকাত দাতাদের নিকট হতে তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং নেতার আদেশে তার হক্বদারের নিকট বিতরণ করেন। তাদেরকে তাদের কর্মের পারিশ্রমিক হিসাবে যাকাত প্রদান করা হবে।

চতুর্থত ঃ যাদের অন্তর জয় করার উদ্দেশ্য হবে ঃ আর তারা দু' শ্রেণীর লোক ঃ কাফির এবং মুসলিম।
- অতঃপর কাফিরকে যাকাত দেওয়া হবে যখন তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রত্যাশা করা যাবে, বা তাকে যাকাত দেওয়ার কারণে মুসলমানদের উপর হতে তার অত্যাচার অনিষ্ট বন্ধ হবে। আরো অনুরূপ কারণে।
- আর মুসলিম ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া হবে তার ইসলাম গ্রহণকে আরো শক্তিশালী করার জন্য বা তারমত আরও একজনের ইসলাম গ্রহণের আশায়। এরমত অন্য আরো কারণে।

পঞ্চমত ঃ দাস সমূহ ঃ আর তারা হলেন ঐ সমস্ত মুকাতিব দাস যাদের কাছে তাদের মালিকের সাথে কৃত চুক্তি পরিশোধের পয়সা নাই। তাই মুকাতিব দাসকে যাকাত হতে যে পরিমাণ প্রদান

করলে সে দাসত্ব হতে মুক্তি পেতে সামর্থ্যবান হবে সে পরিমাণ তাকে প্রদান করা হবে।

ষষ্টতম ঃ ঋণগ্রস্তদেরকে ঃ আর তারা দু' ভাগে বিভক্ত ঃ নিজেদের জন্য ঋণগ্রস্ত, এবং অন্যের কারণে ঋণগ্রস্ত।

- নিজের জন্য ঋণগ্রস্ত ঃ সে ঐ ব্যক্তি যে নিজের অভাবের কারণে ঋণ করেছে আর তা পরিশোধে সে সামর্থ্যবান নয়। তাই যাকাত হতে তাকে যে পরিমাণ দিলে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে সে পরিমাণ তাকে প্রদান করা হবে।

- অন্যের কারণে ঋণগ্রস্ত ঃ সে ঐ ব্যক্তি যে পরস্পরের মাঝে সংশোধন-ফায়সালা করার জন্য ঋণী হয়েছে। তাই সে ঋণী হলে যাকাত হতে যে পরিমাণ দিলে সে ব্যাপারে তার সহযোগিতা হবে, সে পরিমাণ তাকে প্রদান করা হবে।

সপ্তমত ঃ যারা আল্লাহর রাস্তায় রয়েছেন তাদেরকে ঃ এর দ্বারা মুরাদ-উদ্দেশ্য হলো ঃ যারা জিহাদে রয়েছেন। সুতরাং যে সকল মুজাহিদদের বেতন বাইতুল মালের পক্ষ হতে নির্ধারিত নেই তাদেরকে যাকাত প্রদান করা হবে।

অষ্টমত ঃ মুসাফির ঃ সে ঐ মুসাফির যার সব কিছু রাস্তায় শেষ হয়ে গেছে। তার কাছে তার দেশে পৌঁছার মত খরচ নেই।

সুতরাং যাকাত হতে যে পরিমাণ তাকে দিলে সে তার দেশে পৌঁছতে পারবে সে পরিমাণ যাকাত তাকে প্রদান করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা এই শ্রেণীগুলো তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেছেন ঃ

﴿إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السّبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [سورة التوبة، الآية: ٦٠].

অর্থ ঃ বস্তুত ঃ সাদ্কা ফকীরদের, মিসকীনদের, তা আদায়কারীদের, যাদের অন্তর জয় করার উদ্দেশ্য হবে তাদের, দাস মুক্তির, ঋণগ্রস্তদের, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ও মুসাফিরদের জন্য। আল্লাহর কর্তৃক ফরয। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। [সূরা তাওবাহ-আয়াত-৬০]

٧- زكاة الفطر:

৭- যাকাতুল ফিত্বর ঃ

(ক) যাকাতুল ফিত্বর বিধি-বদ্ধর হিক্মাত বা রহস্য ঃ

সিয়াম সাধনা কারীদেরকে অনর্থক কথা-কাজ, সহবাস ও তার আনুসংগীক কর্ম হতে পবিত্র করার জন্য যাকাতুল ফিত্বর চালু করা হয়েছে।

এ ছাড়াও মিসকীনদের খাদ্য হিসাবে ও তাদেরকে ঈদের দিন মানুষের কাছে চাওয়া হতে মুক্ত রাখার জন্য চালু করা হয়েছে।
ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমার) হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন ঃ

((فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين)) [رواه أبو داود وابن ماجه].

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাকাতুল ফিত্বর ফরয করেছেন, সিয়াম সাধনা কারীদেরকে অনর্থক কথা-কায ও সহবাস ও তার আনুসংগীক কাজ হতে পবিত্র করার জন্য ও মিসকীনদের খাদ্য হিসাবে। [হাদীসটি আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন]

(খ) যাকাতুল ফিত্বর এর হুকুম -বিধান ঃ

যাকাতুল ফিত্বর প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারী, ছোট বড়, স্বাধীন-ও দাস দাসীর উপর ফরয।

ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন ঃ

((فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحرّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) [متفق عليه].

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রামাযান মাসের যাকাতুল ফিত্বর ফরয করেছেন, খেজুর বা যবের এক স্বা'আ, দাসের, স্বাধীন ব্যক্তির, পুরুষের, নারীর ছোটদের ও বড়দের উপর। এবং তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন ঈদের নামাযের জন্য মানুষের বের হওয়ার পূর্বে। [বুখারী ও মুসলিম]

যে শিশুর জন্ম হয় নাই পেটে রয়েছে তার পক্ষ হতে তা আদায় করা মুস্তাহাব। নিজের, নিজ স্ত্রী ও নিকটবর্তী আত্মীয় যাদের ভরণ পোষণ করা তার দায়িত্ব রয়েছে তাদের পক্ষ হতে ফিৎরা আদায় করা ওয়াজিব।

ফিৎরা শুধুমাত্র তার উপর ওয়াজিব যার খাদ্য ও ভরণ পোষণ করা তার উপর দায়িত্ব তাদের খাদ্য ঈদের দিন ও রাত্রির জন্য যথেষ্ট হয়ে বেশী হবে।

(গ) ফিৎরার পরিমাণ ঃ

শহরের প্রধান খাদ্য যেমন-গম, যব, খেজুর, কিসমিস-মুনাক্কা, পনির, চাল ও ভুট্টা হতে যাকাতুল ফিতরের নির্ধারিত পরিমাণ হল এক স্বা'আ।

আর এক স্বা'আ প্রায় দু' কিলো একশত ছিয়াত্তর গ্রাম এর সমান। আর অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট ফিৎরার মূল্য বের করা জায়েয

নয়। কারণ ইহা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা আদেশ দিয়েছেন তার বিপরীত এবং সাহাবাদের আমলের পরিপন্থী।

(ঘ) ফিৎরা আদায় করার সময় ঃ

ফিৎরা আদায় করার দুইটি সময় রয়েছে ঃ

(ক) জায়েয সময় ঃ আর তা হলো, ঈদের একদিন বা দু' দিন আগে আদায় করা।

(খ) উত্তম সময় ঃ আর তা হলো, ঈদের দিনের ফজর উদিত হওয়া হতে - ঈদের নামায আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত ফিৎরা আদায় করা।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষদের ঈদের নামাযের জন্য বের হয়ে যাওয়ার আগেই যাকাতুল ফিত্র আদায় করার আদেশ দিয়েছিলেন। যাকাতুল ফিত্র ঈদের নামাযের পর পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ নয়।

কেউ যদি তা ঈদের নামাযের পরে আদায় করে তবে তা সাধারণ সাদ্‌কা (দান) হিসাবে গণ্য হবে। আর সে এই বিলম্বের কারণে গুনাহ্‌গার হবে।

(ঙ) যাকাতুল ফিত্র বিতরণের খাত ঃ

যাকাতুল ফিত্র ফকীর ও মিসকীন এর জন্য বিতরণ করা হয়। কারণ অন্যদের চাইতে এরাই এর অধিক হক্বদার।

الركن الرابع: صيام شهر رمضان
চতুর্থ রুক্ন ঃ রামাযানের সিয়াম সাধন।

١– تعريفه:

১- সিয়ামের-রোযার সংজ্ঞা ঃ

: **الصيام لغة - সিয়ামের শাব্দিক অর্থ ঃ** বিরত থাকা।

: **وشرعاً - পারিভাষিক অর্থ ঃ** ফাজরে সানী উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার রোযা ভঙ্গের কারণ হতে বিরত থাকা।

٢– حكمه:

২- রামাযান মাসের সিয়াম সাধনের বিধান ঃ

ইসলামের রুক্ন সমূহের অন্যতম একটি রুক্ন ও তার মহান স্তম্ভ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿يا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم الصّيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلّكم تتقون﴾[سورة البقرة، الآية:١٨٣].

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ ! তোমাদের উপর সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পারো। [সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৮৩]

ইব্নে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج

بيت الله)) [متفق عليه].

অর্থ ঃ ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দান করা। নামায প্রতিষ্ঠা করা। যাকাত প্রদান করা। রামাযানের রোযা রাখা। বায়তুল্লাহ শরীফের হাজ্জ করা। [বুখারী মুসলিম]

হিজরী সনের দ্বিতীয় বর্ষে মুসলিম উম্মার উপর রামাযানের সিয়াম সাধন ফরয হয়েছে।

٣– فضله وحكمة مشروعيته:

৩- সিয়াম সাধনের ফযিলত ও তা প্রবর্তনের পিছনে হিক্মাত ঃ

রামাযান মাস মহান আল্লাহর আনুগত্য করার বিরাট মৌসম, আর ইহা বান্দার নিকট একটি বিরাট নি'আমত ও মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিরাট অনুগ্রহ। তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান তার প্রতি এর দ্বারা অনুগ্রহ করেন। যাতে তাদের সৎকর্ম বৃদ্ধি পায়, তাদের মান মর্যাদা বেড়ে যায়, এবং তাদের অসৎকর্ম কমে যায়। যাতে তাদের সম্পর্ক তাদের মহান সৃষ্টি কর্তার সাথে আরো শক্তিশালী হয়। যাতে তাদের জন্য লিখা হয় মহা পুরস্কার ও অধিক সাওয়াব। যাতে তারা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। তাঁর ভয়ে ও তাকওয়ায় তাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

রোযার ফযিলত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তার কিছু নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

(ক) আল্লাহ তাবারাক ও তা'আলা বলেন ঃ

﴿شهر رمضان الّذي أنزل فيه القرآن هدى للنّاس وبيّنات من

الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهّر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدّة من أيّامٍ أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدّة ولتكبّروا الله على ما هداكم ولعلّكم تشكرون﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٨٥].

অর্থ ঃ রামাযান মাস, ইহাতে বিশ্ব মানবের দিশারী এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যা সত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। এবং কেহ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে বা ভ্রমণে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না, এই জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা কীর্তন করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। [সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৮৫]

(খ) আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفرله ماتقدم من ذنبه))[متفق عليه].

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি রামাযানের সিয়াম সাধন করবে ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তার পূর্ববর্তী পাপ রাশী ক্ষমা করে দেওয়া হবে। [বুখারী মুসলিম]

(গ) আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عزّ وجلّ: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك)) [رواه البخاري ومسلم والفظ له].

অর্থ ঃ প্রতিটি ভাল কাজের প্রতিদান দশ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ তবে সাওম ছাড়া। কারণ সাওম হল আমার জন্য, আর আমি তার প্রতিদান প্রদান করবো। কারণ সে শুধুমাত্র আমার জন্যই তার প্রবৃত্তির অনুসরণ ও পানাহার বর্জন করেছে। সিয়াম সাধন কারীর জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। একটি আনন্দ ইফতারের সময়, অপর আনন্দটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। আর সিয়াম সাধন কারীর মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মেসকের সুগন্ধির চাইতেও অধিক সুগন্ধি পূর্ণ। [বুখারী ও মুসলিম শব্দ গুলো ইমাম মুসলিমের]

(ঘ) সিয়াম সাধন কারীর দু'আ মাকবুল নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম) বলেছেন ঃ

((للصائم عند فطره دعوة لا ترد)) [رواه ابن ماجه].

অর্থ ঃ সিয়াম সাধন কারীর ইফতারের সময় তার দু'আ গৃহীত হয়। [ইবনে মাজাহ]

তাই প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উচিত হবে তার ইফতারের সময়টাকে গনিমত মনে করে তার প্রভুর কাছে চাওয়া ও প্রার্থনার মাধ্যমে আগ্রহী হওয়া। হতে পারে সে মহান আল্লাহর সুগন্ধির কিছু সুগন্ধি পেয়ে যাবে। অতঃপর দুনিয়া ও আখেরাতে তার সৌভাগ্যময় জীবন অর্জীত হবে।

(ঙ) আল্লাহ জান্নাতের দরজা সমূহের একটি দরজা সিয়াম সাধন কারীদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এই দরজা দিয়ে শুধু সিয়াম সাধন কারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের সম্মানার্থে ও অন্যদের উপর তাদের বৈশিষ্ট সাব্যস্ত করনার্থে।

সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((إن في الجنة باباً يقال له (الريان) فإذا كان يوم القيامة قيل: أين الصائمون، فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل منه أحد)) [متفق عليه].

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে যার নাম হল- রাইয়্যান। অতএব যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সে দিন বলা হবে সিয়াম সাধন কারীরা কোথায় ? তাদের প্রবেশ শেষে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তা দিয়ে আর কেহ প্রবেশ করতে পারবেনা। [বুখারী ও মুসলিম]

(চ) কিয়ামাত দিবসে সিয়াম সাধন কারীর জন্য সিয়াম সুপারিশ করবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনেল আছ (রাযিআল্লাহু আনহুম) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته من الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان)) [رواه أحمد].

অর্থ ঃ সিয়াম ও কুরআন কিয়ামাত দিবসে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে ঃ হে আমার প্রভু ! আমি তাকে পানাহার ও স্ত্রীসঙ্গম হতে বিরত রেখেছিলাম। অতঃপর তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর। আর কুরআন বলবে ঃ রাতে আমি তাকে ঘুম

হতে বিরত রেখেছিলাম। অতঃপর তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর। তিনি বলেন ঃ অতঃপর উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। [আহমাদ]

(ছ) আর সিয়াম মুসলিম ব্যক্তিকে ধৈর্য, কষ্ট, সাধনা ও কোন কাজ মনোযোগ সহকারে পালন করার শিক্ষা দেয় বা অভ্যাস গড়ে তুলে। আর সিয়াম সাধন কারীকে তার প্রিয় ও প্রসিদ্ধ বস্তু ছাড়াতে পরিত্যাগে বাধ্য করে। আর তা অবাধ্য আত্নাকে বাধ্য করে, অথচ এতে বিরাট কষ্ট রয়েছে।

٤– شروط وجوبه:

৪- সিয়াম ফরয হওয়ার শর্ত সমূহ ঃ

নিশ্চয়ই সিয়াম সাধন প্রত্যেক বালেগ-প্রাপ্ত বয়স্ক আকেল-জ্ঞানবান সহীহ-সুস্থ্য মুকীম মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরয হওয়ার উপর সকল আলেমগণ একমত হয়েছেন।

হায়েয ও নিফাসরত মহিলা ছাড়া অন্যান্য মহিলাদের উপরও সিয়াম সাধন ফরয।

٥– آدابه:

৫- সিয়াম সাধনের আদাব সমূহ ঃ

(ক) গিবাত করা, চুগোল খোরী করা এবং এ দু'টি ছাড়াও অন্যান্য কর্ম যা আল্লাহ হারাম করেছেন তা থেকে সিয়াম সাধন কারীর বিরত থাকা। তাই প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর অপরিহার্য যে, সে তার জবানকে সকল হারাম কথাবার্তা হতে ও অন্যদের চরিত্রতে আঘাত হানা হতে বিরত রাখবে।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع

طعامه وشرابه)) [رواه البخاري].

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও মিথ্যার প্রতি আমল করা ছেড়ে দিলনা সে ব্যক্তির খানাদানা-পানাহার ছেড়ে দেওয়ায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। [বুখারী]

(খ) সিয়াম সাধন কারী সাহ্‌রী খাওয়া ছাড়বেনা। কারণ ইহা তাকে তার সিয়াম সাধনে সহযোগিতা করে। অতঃপর সে আরামে দিন অতিবাহিত করতে পারবে। ফুর্তি ও স্বজীবতার সাথে তার কর্ম আদায় করতে পারবে।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর নিম্নে বর্ণিত বাণী দ্বারা বলেছেন ঃ

((السحور أكلة بركة، فلا تدعوه، ولو أن يخرج أحدكم جرعة من ماء فإن الله عزّ وجلّ وملائكته يصلون على المتسحرين)) [رواه أحمد].

অর্থ ঃ সাহ্‌রী বরকতের খাবার, তা ছেড়ে দিওনা। যদিও তোমাদের কেহ এক ঢোক পানি পান করে, তার পর ও আল্লাহ তা'আলা সাহ্‌রী খানে ওলাদের প্রতি রাহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্‌তারা তাদের জন্য দু'আ করেন। [আহমাদ]

(গ) নিশ্চিত ভাবে সূর্য ডুবার সাথে সাথেই ইফতার করা।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)) [متفق عليه].

অর্থ ঃ মানুষ যতক্ষন তাড়াতাড়ী ইফতার করবে, ততক্ষন তারা ভাল থাকবে। [বুখারী মুসলিম]

(ঘ) রূত্বাব (অর্ধপক্ক খেজুর) বা খেজুর দিয়ে ইফতার করার চেষ্টা করবে, কারণ ইহা সুন্নাত। আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন ঃ

((كان رسول الله ﷺ يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء)) [رواه أبو داود].

অর্থ ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযের পূর্বে রূত্বাব দিয়ে ইফতার করতেন। আর রত্বাব না থাকলে খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন, আর খেজুর না থাকলে পানি দিয়ে ইফতার করতেন। [আবু দাউদ]

(ঙ) কুরআন পাঠ আল্লাহ তা'আলার যিকির তাঁর প্রশংসা ও তাঁর শুকরিয়া, দান, দয়া, নফল ইবাদাত ও অন্যান্য সৎকাজ বেশী বেশী করা।

কারণ ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেন ঃ

((كان رسول الله ﷺ أجود النّاس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن، فلرسول الله ﷺ حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة)) [رواه البخاري ومسلم].

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকলের চাইতে অধিক দানবীর ছিলেন। রামাযান মাসে যখন তাঁর সাথে জিব্রাঈল সাক্ষাত করতেন তখন তিনি আরো অধিক দানবীর হয়ে যেতেন। আর জিব্রাঈল রামাযানের প্রতি রাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন, ও তাঁকে কুরআন পড়াতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাথে যখন জিব্রাঈল সাক্ষাত করতেন তখন তিনি প্রবাহমান বায়ুর চাইতেও অধিক দানবীর হয়ে যেতেন। [বুখারী ও মুসলিম]

٦– مفسداته:

৬- সিয়াম বিনষ্ট কারী বিষয় সমূহ ঃ

দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করা। অনুরূপ ভাবে সকল সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ, যেমন খাদ্যের ইন্‌জেকশন বা মুখের সাহায্যে ঔষধ গ্রহণ। কারণ ইহা পানাহারের বিধানের অন্ত র্ভুক্ত। তবে অল্প রক্ত বের করা যেমন-পরীক্ষার জন্য বের করা, ইহা সিয়ামের কোন ক্ষতি করবেনা।

রামাযান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করা। কারণ ইহা তার সিয়ামকে নষ্ট করে দিবে। রামাযান মাসের সম্মান নষ্ট করার কারণে তার উপর আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করা অপরিহার্য হয়ে দাড়াবে। যে দিবসে সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে সে দিবসের সিয়াম কাযা করবে। তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। আর তা হল ঃ একজন দাস আজাদ করা, আর এর সামর্থ্য না থাকলে ধারাবাহিক দু' মাসের সিয়াম সাধন করা, এর সামর্থ্য না থাকলে ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো। প্রতি মিসকীনের জন্য গম বা অন্য কিছু যা শহর বাসীর নিকট খাদ্য হিসাবে গণ্য তা হতে অর্ধ সা'আ দেওয়া।

কারণ আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছে, তিনি বলেন ঃ

((بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاء رجل، فقال: يارسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال: لا. قال : فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ قال: لا. قال: فمكث النبي ﷺ فبينما نحن

على ذلك أتي النبي ﷺ بفرق فيه تمر – والفرق المكتل، وقال أين السائل؟ فقال: أنا قال : خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل : على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها – يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك)) [رواه البخاري ومسلم].

অর্থ ঃ একদা আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট বসা ছিলাম, হঠাৎ এক লোক আগমণ করলো, অতঃপর বল্‌ল হে আল্লাহর রাসূল আমি ধ্বংস হয়েগেছি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন তোমার কি হয়েছে ? সে বল্‌ল আমি সিয়াম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন তুমি কি একটি দাস আজাদ করতে পারবে ? সে বল্‌ল না। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন তুমি কি দু'মাস পর্যায় ক্রমে সিয়াম সাধন করতে পারবে ? সে বল্‌ল না। তারপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন তুমি কি ষাট মিসকীনকে খানা খাওয়াতে পারবে ? সে বল্‌ল না। বর্ণনা কারী বলেন ঃ তারপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। আমরা এই অবস্থাই ছিলাম, এমতাবস্থায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট ফারাক্ব নিয়ে আসা হলো যাতে খেজুর ছিল। আর ফারাক্ব মিকতাল নির্ধারিত পরিমাণকে বলা হয়। তারপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন ঃ প্রশ্ন কারী কোথায় ? তারপর সে উত্তর দিল যে, আমি। তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন ঃ এগুলো নিয়ে যেয়ে সাদ্‌কা করে দাও। সে ব্যক্তি বল্‌ল হে আল্লাহর রাসূল ! আমার চেয়েও অধিক গরীবের

উপর, (সে বল্‌ল) আল্লাহর শপথ মদিনার এই দু'হার্‌রার (অর্থাৎ সমগ্র মদিনার) মাঝে আমার পরিবারের চেয়ে দরিদ্র পরিবার আর নেই। একথা শুনে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাঁসলেন। এমনকি তাঁর আনইয়াব নামক দাঁত প্রকাশ হয়ে গেল। তারপর বল্‌লেন (যাও) তা তোমার পরিবারকে খাওয়াও। [বুখারী ও মুসলিম]

চুমু, সহবাস বা হস্ত মৈথুনে বীর্য বের করা। সিয়াম সাধন কারী যদি উল্লেখিত কারণ সমূহের যে কোন একটি কারণ দ্বারা বীর্য বের করে তবে তার সাওম বাতিল হয়ে যাবে, তা কাযা করা অপরিহার্য হয়ে যাবে, দিনের বাকী অংশ পানাহার ইত্যাদি হতে বিরত থাকবে। তার উপর কাফ্‌ফারা ধার্য হবে না। আর সে তাওবা করবে, লজ্জীত হবে, ক্ষমা চাবে, কামভাব উত্তেজীত করে এমন সকল অপকর্ম হতে দূরে থাকবে। যদি সিয়াম সাধন অবস্থায় ঘুমের ঘরে স্বপ্নদোষ হয়ে বীর্যপাত হয়, তবে তার সিয়াম সাধনের উপর কোন প্রভাব পড়বেনা ও তার উপর কোন কিছু ধার্য হবে না। তবে তার উপর গোসল করা অপরিহার্য হবে।

পাকস্থলীতে বিদ্যমান বস্তু মুখ দিয়ে বের করে ইচ্ছা কৃত বমি করা। কিন্তু বিনা ইচ্ছায় যদি কিছু বের হয়ে যায় তবে তা তার সিয়ামের উপর কোন প্রভাব ফেলবেনা।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض)) [رواه أبو داود والترمذي].

অর্থ ঃ যার বমি হয়ে যাবে তার উপর কাযা নেই। আর যে ইচ্ছাকৃত বমি করলো সে কাযা করবে। [আবু দাউদ ও তিরমিযী]

হায়েয ও নিফাস দেখা দিলে। আর তা দিনের প্রথম অংশে

হোক বা শেষাংশে সূর্য ডুবার পূর্ব মুহুর্তে হোক।

সিয়াম সাধন কারীর জন্য সিঙ্গা লাগানো ছেড়ে দেওয়া উত্তম। যাতে ইহা তার সিয়াম নষ্টের কারণ না হয়। রক্ত দানের জন্য রক্তবের না করা উত্তম। তবে অসুস্থ্য ও অনুরূপ ব্যক্তির সহযোগিতার তাগিদে রক্ত দান করলে অসুবিধা নেই। আর যদি নাক দিয়ে বা কাশির সাথে বা জখম হওয়ার কারণে বা দাঁত উঠানোর কারণে ও অনুরূপ কারণে রক্ত বের হয়, তবে ইহা তার সিয়ামের উপর কোন প্রভাব ফেলবেনা।

٧- أحكام عامة:

৭- সিয়ামের বা রোযার সাধারণ বিধান সমূহ ঃ

চাঁদ দেখার মাধ্যমে রামাযান মাসের সিয়াম সাধন ফরয প্রমাণিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٨٥].

অর্থ ঃ সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। [সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৮৫]

চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য একজন ন্যায় পরায়ণ মুসলিম ব্যক্তির সাক্ষীই যথেষ্ট।

ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেন ঃ

((تراءى النّاس الهلال فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته فصام وأمر النّاس بصيامه)) [رواه أبو داود والدارمي وغيرهما].

অর্থ ঃ মানুষ একে অপরে চাঁদ দেখতে ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সংবাদ দিলাম যে আমি চাঁদ

দেখেছি। তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিয়াম সাধন করলেন ও মানুষদেরকে সিয়াম সাধনের আদেশ দিলেন। [আবু দাউদ, দারেমী ও অন্যান্যরা এই হাদীস বর্ণনা করেছেন]

প্রত্যেক দেশে-দেশের রাজার হুকুম সিয়াম সাধন শুরুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সে যদি সিয়াম সাধনের আদেশ করে অথবা সিয়াম সাধন করতে নিষেধ করে, তার আনুগত্য করা ওয়াজিব হবে। আর যদি দেশের রাজা কাফের হয় তবে দেশে ইসলামী ঐক্য ঠিক রাখার জন্য ইসলামী সেন্টার বা অনুরূপ বোর্ডের বিধান কার্যকর হবে।

চাঁদ দেখার ব্যাপারে দুরদর্শন যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া জায়েয আছে। রামাযান শুরু বা শেষ সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে কক্ষ পথের হিসাবের ও তারকা দেখার উপর ভরসা করা ঠিক নয়। কেবল মাত্র চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করা হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٨٥].

অর্থ ঃ সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। [সূরা আল-বাক্বারাহ্-আয়াত-১৮৫]

প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে যে ব্যক্তি রামাযান মাসকে পাবে তার উপর সে মাসের দিন গুলো তা ছোট হউক বা বড় হউক সিয়াম সাধন করা ফরয হবে। প্রত্যেক দেশে রামাযান মাসের সিয়াম সাধন শুরু হওয়ার ব্যাপারে মানদন্ড হলো তার চাঁদ উদিত হওয়ার স্থানে চাঁদ দেখা। আর ইহা বিদ্যানগুণের অধিক গ্রহণযোগ্য মত। কারণ চাঁদ উদিত হওয়ার স্থান সমূহ ভিন্ন এর উপর উলামাদের ঐক্যমত রয়েছে। আর এটাই প্রমাণিত হয় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী দ্বারা, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً)) [أخرجه البخاري ومسلم].

অর্থ ঃ -তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম সাধন শুরু কর। আবার চাঁদ দেখেই সিয়াম সাধন ছেড়ে দাও। আর তোমরা যদি চাঁদ দেখতে নাপাও তবে শা'বান মাসকে ত্রিশ দিনে পুরা কর। [বুখারী ও মুসলিম]

সিয়াম সাধন কারীর রাতেই সিয়ামের নিয়াত করা আবশ্যক।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((إنما الأعمل بالنيّات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) [متفق عليه].

অর্থ ঃ কর্মের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়াত করবে তাই তার জন্য অর্জীত হবে। [বুখারী ও মুসলিম]

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন ঃ

((من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)) [أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث حفصة رضي الله عنها].

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে সিয়াম সাধনের নিয়াত করবেনা, তার সিয়াম সাধন শুদ্ধ হবে না। [এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন হাফসা (রাযিআল্লাহু আনহা) এর বর্ণিত হাদীস হতে]

অজর যুক্ত ব্যক্তি যেমন অসুস্থ্য বা মুসাফির ব্যক্তি বা হায়েয বা নিফাসরত মহিলা বা গর্ভধারিণী, বা বাচ্চাকে দুধ পান কারীনি

মহিলা ছাড়া কারো জন্য রামাযান মাসের সিয়াম সাধন ছেড়ে দেওয়া বৈধ নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيّام أخر﴾ [سورة البقرة،الآية: ١٨٤].

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিবে। [সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৮৪]

অতঃপর অসুস্থ্য ব্যক্তি যার উপর সিয়াম সাধন কষ্টকর হবে, সিয়াম ভঙ্গকারী কারণ সমূহ হতে বিরত থাকা কঠিন হবে, ও তার দ্বারা সে ক্ষতি গ্রস্থ হবে, তার জন্য রামাযান মাসের সিয়াম ছেড়ে দেওয়া বৈধ হবে। রামাযানের মাসে যে কয় দিনের সিয়াম ছেড়ে দিয়েছিল রামাযানের পর সে কয় দিনের সিয়াম কাযা আদায় করবে। যদি গর্ভধারিণী ও দুধ পান কারীনি শুধু নিজেদের কষ্টের আশংকা করে তবে সিয়াম ছেড়ে দিবে। ও তাদের উপর কাযা করা আবশ্যক হবে, এর উপর আলেমগণের ইজমা রয়েছে।

কারণ তারা দু'জন প্রাণ নাশের আশংকা করে এমন অসুস্থ্য ব্যক্তির সমপর্যায়।

আর যদি নিজেদের ও সন্তানের কষ্টের আশংকা করে বা শুধু সন্তানের কষ্টের আশংকা করে তবে তারা সিয়াম সাধন ছেড়ে দিবে, তাদের উপর কাযা আবশ্যক হবে। কারণ আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) মারফু' হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

((إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع)) [رواه النسائي وابن خزيمة وهو حديث حسن].

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরের, গর্ভধারিণী ও দুধ

পান কারীনির অর্ধেক সালাত ও সিয়াম মাফ করে দিয়েছেন। [নাসায়ী ও ইবনে খুযাইমা হাদীসটি হাসান হিসাবে বর্ণনা করেছেন]

তবে অতি বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলা তাদের জন্য সিয়াম ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি আছে। যদি সিয়াম সাধন তাদের পক্ষে খুব কষ্টকর হয়। তাদের উপর প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো আবশ্যক হবে।

কারণ ইমাম বুখারী আতা হতে বর্ণনা করেছেন সে ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) কে নিম্নের আয়াত পাঠ করতে শুনেছেন ঃ

﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينٍ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٨٤].

অর্থ ঃ আর যারা ওতে (সিয়াম সাধনে) অক্ষম তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে বা খাওয়াবে। [সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৮৪]

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেন ঃ

((ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً)).

অর্থ ঃ এই আয়াতটি রহিত নয়। বরং ইহা অতি বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলা যাদের সিয়াম সাধনের সামর্থ্য নেই তাদের ব্যাপারে। তারা প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে।

আর সফর বা ভ্রমণ হল সিয়াম সাধন ছেড়ে দেওয়ার গ্রহণযোগ্য কারণ সমূহের একটি কারণ।

কারণ আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন ঃ

((كنا نسافر مع النبي ﷺ، فلم يعب الصائم على المفطر ولا

المفطر على الصائم)) [متفق عليه].

অর্থ ঃ আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা) এর সাথে সফর করতাম। সিয়াম সাধন কারীরা সিয়াম ত্যাগ কারীদের, আর সিয়াম ত্যাগ কারীরা সিয়াম সাধন কারীদের দোষারুপ করতোনা। [বুখারী মুসলিম]

الركن الخامس: الحج
পঞ্চম রুক্‌ন ঃ হাজ্জ।

١– تعريفه:

১- হাজ্জের সংজ্ঞা ঃ

الحج في اللغة: - হাজ্জের শাব্দিক অর্থ ঃ القصد (আলকাসদু) ইচ্ছা করা। আরবী ভাষায় বলা হয় ঃ حج إلينا فلان: অমুকে আমাদের নিকট হাজ্জ করেছে। অর্থাৎ সে আমাদের নিকট আসার ইচ্ছা করেছে ও আমাদের নিকট এসেছে।

وفي الشرع: - হাজ্জের পারিভাষিক অর্থ ঃ নির্ধারিত শর্তসহ নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদাত করার জন্য মাক্কায় গমণের ইচ্ছা করাকে হাজ্জ বলে।

٢– حكمه:

২- হাজ্জের হুকুম ঃ

সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর তার জীবনে একবার হাজ্জ ফরয হওয়া এবং তা পাঁচটি স্তম্ভ যার উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত তার অন্যতম একটি স্তম্ভ হওয়ার ব্যাপারে উম্মাত ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ

﴿ولله على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإنّ الله غنيّ عن العلمين﴾ [سورة آل عمران، الآية: ٩٧].

অর্থ ঃ মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হাজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। এবং কেহ প্রত্যাখ্যান করলে সে জানিয়া রাখুক আল্লাহ বিশ্ব-জগতের

মুখাপেক্ষী নহেন। [সূরা আলি-ইমরান-আয়াত-৯৭]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله)) [متفق عليه].

অর্থ ঃ ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দান করা। নামায প্রতিষ্ঠা করা। যাকাত প্রদান করা। রামাযানের সিয়াম পালন করা। বায়তুল্লাহ শরীফের হাজ্জ করা। [বুখারী মুসলিম]

তিনি বিদায় হাজ্জের ভাষণে আরো বলেন ঃ

((يا أيها الناس إن الله فرض عليكم حج البيت فحجوا)) [رواه مسلم].

অর্থ ঃ হে মানব জাতি ! আল্লাহ তোমাদের উপর বায়তুল্লাহর হাজ্জ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হাজ্জ কর। [মুসলিম]

٣- فضله والحكمة من مشروعيته:

৩- হাজ্জের ফযিলত ও তা প্রবর্তনের পিছনে হিক্‌মাত ঃ

হাজ্জের ফযিলতে অনেক দলীল বর্ণিত হয়েছে।

তন্মধ্যে তাঁর (আল্লাহর) বাণী ঃ

﴿وأذن في الناس بالحجّ يأتوك رجالاً وعلى كلِّ ضامر يأتين من كل فجٍّ عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ [سورة الحج، الآيتان: ٢٧- ٢٨].

অর্থ ঃ এবং মানুষের নিকট হাজ্জ এর ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে, তারা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে। যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থান গুলিতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুস্পদ জন্তু হতে যাহা রিয্ক হিসাবে দান করেছেন উহার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারবে। [সূরা আল-হাজ্জ-আয়াত-২৭ -২৮]

আর হাজ্জ সকল মুসলমানের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে অনেক কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে। সুতরাং হাজ্জের মধ্যে নানা প্রকার ইবাদাতের সমাবেশ রয়েছে, যেমন কা'বা শরীফের তাওয়াফ, সাফা মারওয়ার মাঝে সা'ঈ, আরাফাতে, মিনায়, মুয্দালিফায় অবস্থান, কঙ্কর নিক্ষেপ, মিনায় রাত্রি যাপন, হাদী জবেহ, মাথার চুল মুন্ডানো, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য তাঁর কাছে বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করার জন্য ও তাঁর দিকে ধাবমান হওয়ার জন্য বেশী বেশী আল্লাহর যিকির। তাই হাজ্জ হলো পাপ মোচনের ও জান্নাতে প্রবেশের কারণ সমূহের অন্যতম একটি কারণ।

আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

((سمعت رسول الله ﷺ يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) [رواه البخاري ومسلم].

অর্থ ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি এই ঘরের হাজ্জ করলো আর সে নির্লজ্জ কোন কথা বার্তা ও ফাসেকী কোন কর্মে লিপ্ত হলোনা সে তার পাপ হতে ফিরে আসলো সেই দিনের ন্যায় যে দিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল। [বুখারী ও মুসলিম]

আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) [رواه البخاري ومسلم].

অর্থ ঃ এক উম্‌রাহ হতে অপর উম্‌রাহ এই দুইয়ের মাঝে কৃত পাপের কাফ্‌ফারা। আর গৃহীত হাজ্জের একমাত্র প্রতিদান হল জান্নাত। [বুখারী ও মুসলিম]

আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ

((سئل رسول الله ﷺ أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال حج مبرور)) [متفق عليه].

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কোন কাজটি অতি উত্তম ? তিনি বল্‌লেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। বলা হলো ঃ তার পর কোনটি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। বলা হলো তার পর কোনটি ? তিনি বললেন ঃ গৃহীত হাজ্জ। [বুখারী ও মুসলিম একত্রিত ভাবে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহ আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة)) [رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح].

অর্থ ঃ তোমরা হাজ্জ ও উম্‌রাহ্ পর্যায়ক্রমে করতে থাক। কারণ এ দু'টি দরিদ্রতা দূর করে আর পাপ মোচন করে। যেমন কর্মকারের অগ্নিকন্ড লোহার, সোনা ও রূপার মরিচা দূর করে। আর গৃহীত হাজ্জের একমাত্র প্রতিদান হলো জান্নাত। [হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, হাসান ও সহীহ বলেছেন]

বিশ্বের দূর-দূরান্ত হতে আগত মুসলমানদের আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়স্থানে একে অপরের মিলন, পরস্পরের পরিচয় লাভ, কল্যাণ কর ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করার সুযোগ ও তাদের কথা কাজ ও যিকির এক হওয়া হাজ্জের উপকারিতার

অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে তাদের আক্বীদায়, ইবাদাতে, উদ্দেশ্য ও ওয়াসিলাতে ঐক্যের ও একত্রিতের প্রশিক্ষণ রয়েছে। আর তাদের এই একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে তাদের মাঝে পরস্পর পরিচয় লাভ হয়, বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় ও এক অপর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পায়, ও আল্লাহ তা'আলার কথা বাস্তবায়িত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ﴾ [سورة الحجرات،الآية: ١٣].

অর্থ ঃ হে মানুষ ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন। [সূরা আল-হিজরাত-আয়াত-১৩]

٤- شروط وجوبه:

৪- হাজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত সমূহ ঃ

(ক) হাজ্জ ফরয হয় পাঁচটি শর্তে এতে বিদ্যানগণের মতনৈক্য নেই। আর তা হলো ঃ

ইসলাম বা মুসলিম হওয়া, জ্ঞানবান হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, স্বাধীন হওয়া, ও সামর্থ্য থাকা। তবে মহিলার উপর হাজ্জ ফরয হওয়ার জন্য হাজ্জের সফরে তার সাথে মাহ্‌রাম থাকা আবশ্যক।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم)) [متفق عليه].

অর্থ ঃ আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এমন মহিলার জন্য বিনা মাহ্‌রামে (বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ এমন পুরুষ।) একদিনের দূরত্বের পথও সফর করা বৈধ নয়। আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) এই হাদীসটি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। [বুখারী ও মুসলিম]

ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এই শর্ত গুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ

প্রথমত ঃ হাজ্জ সহীহ ও ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত, তা হলো ঃ ইসলাম ও জ্ঞান, তাই কাফির ও পাগলের উপর হাজ্জ ফরয নয়। তাহাদের পক্ষ হতে হাজ্জ শুদ্ধও হবে না। কারণ তাহারা ইবাদাত কারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ যা ওয়াজিব ও যথেষ্ট হওয়ার জন্য শর্ত, তা হলো ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ও স্বাধীন হওয়া, ইহাদের (হাজ্জ) সহীহ হওয়ার শর্ত নয়। তাই যদি বাচ্চা ও দাস হাজ্জ করে, তাহাদের হাজ্জ সহীহ

হবে। তবে তাহাদের এই হাজ্জ ইসলামের ফরয হাজ্জ হিসাবে যথেষ্ট হবে না।

তৃতীয়ত ঃ যা শুধু ফরয হওয়ার জন্য শর্ত। আর তা হলো সামর্থ্যতা। তবে সামর্থ্যহীন ব্যক্তি যদি কষ্ট করে হাজ্জ করে এবং যদি পাথেয় ও যানবাহন ছাড়াই হাজ্জে চলে যায় তবে তার হাজ্জ সহীহ হবে।

(খ) হাজ্জ আদায়ে প্রতিনিধি নিযুক্ত করার বিধান ঃ

যে ব্যক্তি হাজ্জ আদায়ের সামর্থ্যবান হওয়ার পূর্বে মারা যাবে, তার উপর ফরয হবে না। এতে বিদ্যানগণের মাঝে কোন মতনৈক্য নেই। তবে যে ব্যক্তি হাজ্জ আদায়ের সামর্থ্যবান হওয়ার পর মারা যাবে, তার উপর হতে মৃত্যুর কারণে ফরয সাকেত হবে কি হবে না এ ব্যাপারে মতনৈক্য রয়েছে। তবে সঠিক মত হলো মৃত্যু ব্যক্তির পক্ষ হতে হাজ্জের ফারযিয়াত সাকেত হবে না।

মৃত্যু ব্যক্তির ওয়ারিসদের উপর তার পক্ষ হতে তার মাল হতে হাজ্জ করা অপরিহার্য হবে, সে তার পক্ষ থেকে হাজ্জ আদায়ের ওসিয়াত করে যান আর নাই যান। তা তার উপর সব দিক দিয়ে ঋণের ন্যায় ওয়াজিব হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে।

কারণ ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হাদীস বর্ণনা করেছেন। জনৈক মহিলা হাজ্জ করার নজর মেনে মারা যায়।

অতঃপর তার ভাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসে তাঁকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্লেন ঃ

((أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء)) [رواه النسائي].

অর্থ ঃ তোমার কি মত ? যদি তোমার বোনের উপর ঋণ

থাকতো তাহলে তুমি কি তা আদায় করতেনা ? সে বল্‌ল হ্যাঁ। তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন আল্লাহর ঋণ আদায় কর, কারণ আল্লাহর ঋণ আদায় করা অধিক যুক্তি যুক্ত। [নাসায়ী]

(গ) যে ব্যক্তি নিজে হাজ্জ করে নাই সে অন্যের পক্ষ হতে বদল হাজ্জ করতে পারবে কি ?

যে ব্যক্তি প্রথমে নিজের হাজ্জ করে নাই সে অন্যের পক্ষ হতে বদল হাজ্জ করতে পারবেনা। ইহা বিদ্যানগণের সঠিক মত।

কারণ এ ব্যাপারে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে, আর তা হলো ঃ

((أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال عليه الصلاة والسلام: حجت عن نفسك؟ قال لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)) [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وصححه].

অর্থ ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে লাব্বাইক আন শুব্‌রামাহ বলতে শুনলেন। অতঃপর (তাকে) বল্‌লেন শুব্‌রামাহ কে ? সে বল্‌ল আমার ভাই বা আমার নিকট আত্নীয়। তারপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন তুমি তোমার হাজ্জ করেছ ? সে বল্‌ল না। তারপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন আগে তুমি নিজের হাজ্জ কর, তারপর শুব্‌রামার হাজ্জ কর। [এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী বর্ণনা করেছেন, ইমাম বাইহাকী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

সামর্থ্যহীন অপারগ ব্যক্তির পক্ষ হতে বদল হাজ্জ সঠিক মতে সহীহ হবে।

কারণ এ ব্যাপারে ফজল বিন আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমার) একটি হাদীস রয়েছে ঃ

((وفيه أن امرأة من خثعم قالت: يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع)) [متفق عليه اللفظ للبخاري].

অর্থ ঃ আর তাতে আছে খাছআমা কাবিলার জনৈক মহিলা বল্‌ল হে আল্লাহর রাসূল ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ সে যানবাহনে স্থীর থাকতে পারেনা। তার উপর আল্লাহর ফারিযাহ-হাজ্জ ফরয হয়েছে। আমি কি তাঁর পক্ষ হতে বদল হাজ্জ করতে পারবো ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন হ্যাঁ। তার পক্ষ হতে বদল হাজ্জ কর। এই ঘটনা বিদায় হাজ্জে ঘটে ছিল। [বুখারী ও মুসলিম, তবে শব্দ গুলো বুখারীর]

(ঘ) হাজ্জ অবিলম্বে ফরয না বিলম্বে ফরয ?

হাজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পুরা হওয়ার সাথে সাথেই হাজ্জ ফরয হবে, ইহা বিদ্যানগণের গ্রহণ যোগ্য মত।

কারণ এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী আম বা ব্যাপক রয়েছে যেমন ঃ

﴿ولله على النّاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾

[سورة آل عمران،الآية: ٩٧].

অর্থ ঃ মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হাজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। [সূরা আলি-ইমরান-আয়াত-৯৭]

আরো আল্লাহর বাণী হলো ঃ

﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩٦].

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ ও উম্‌রাহ পূর্ণ কর।

[সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৯৬]

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)) [رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه].

অর্থ ঃ তোমরা ফরয হাজ্জের জন্য তাড়াতাড়ী কর, কেননা তোমাদের কেহই একথা জানেনা যে, তাহার ভাগ্যে কি রহিয়াছে। [হাদীসটি আবু দাউদ, আহমাদ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, হাকেম হাদীসটি সহীহ বলেছেন]

٥– أركان الحج:

৫- হাজ্জের আর্‌কান বা রুক্‌ন সমূহ ঃ

হাজ্জের আর্‌কান চারটি ঃ

(ক) ইহ্‌রাম বাঁধা।

(খ) আরাফায় অবস্থান করা।

(গ) তাওয়াফুয যিয়ারা।

(ঘ) সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা।

আর এই চারটি আর্‌কানের কোন একটি রুক্‌ন ছুটে গেলে হাজ্জ পূর্ণ হবে না।

প্রথম রুক্‌ন ঃ ইহ্‌রাম বাঁধা।

ইহ্‌রামের সংজ্ঞা ঃ ইহ্‌রাম হলো, ইবাদাতে প্রবেশের নিয়াত করা।

হাজ্জের মীকাত ঃ হাজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার মীকাত দু' প্রকার ঃ

(১) সময়ের মীকাত।

(২) স্থানের মীকাত।

- সময়ের মীকাত ঃ আর তা হলো ঃ

হাজ্জের মাস সমূহ যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿الحج أشهر معلومات﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩٧].

অর্থ ঃ হাজ্জ হয় সুবিদিত মাসে। [সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৯৭]

আর তা হলো ঃ শাওয়াল, যুলকা'দা, ও যুলহাজ্জাহ।

- স্থানের মীকাত ঃ আর তা হলো ঃ ঐ সীমা সমূহ যা হাজী সাহেবদের জন্য বিনা ইহ্রামে অতিক্রম করে মক্কার দিকে যাওয়া ঠিক নয়। আর তা হলো পাঁচটি ঃ

প্রথম ঃ (যুলহুলাইফা) বর্তমানে এর নাম "আবারে আলী" ইহা মদিনা বাসীদের মীকাত, ইহা মক্কা হতে (৩৩৬) কিঃ মিঃ অর্থাৎ ২২৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

দ্বিতীয় ঃ (আল-জুহ্ফা) ইহা একটি গ্রাম, সে গ্রাম ও লোহিত সাগরের মাঝে দূরত্ব হলো (১০) কিঃ মিঃ, ইহা মক্কা হতে (১৮০) কিঃ মিঃ অর্থাৎ (১২০) মাইল দূরে অবস্থিত। আর ইহা মিসর, সিরীয়া, মরক্ক ও এদের পিছনে বসবাস কারী স্পেন, রূম ও তিক্রূর বাসীদের মীকাত। বর্তমানে মানুষ (রাবেগ) হতে ইহ্রাম বাঁধে। কারণ ইহা তার কিছুটা বরাবর।

তৃতীয় ঃ (ইয়ালামলাম) বর্তমানে ইহা (আস্সা'দীয়া) নামে পরিচিত। আর ইহা তুহামাহ (সারিবদ্ধ) পর্বত সমূহের একটি পর্বত। ইহা মক্কা হতে (৭২) কিঃ মিঃ অর্থাৎ (৪৮) মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা ইয়েমেন আহলে জাওয়াহ, ভারতীয় উপমহাদেশের ও চীন বাসীদের মীকাত।

চতুর্থ ঃ (ক্বারনু মানাযেল) বর্তমানে এর নাম "আস্‌সাইলুল কাবীর" ইহা মক্কা হতে (৭২) কিঃ মিঃ অর্থাৎ (৪৮) মাইল দূরে অবস্থিত। আর ইহা নাজদ ও ত্বায়েফ বাসীদের মীকাত।

পঞ্চম ঃ (যাতে ইর্‌ক্ব) ইহা বর্তমানে (আয্‌যারীবাহ) নামে পরিচিত, এর নাম যাতে ইর্‌ক্ব রাখা হয়েছে। কারণ তথায় ইর্‌ক্ব আছে। আর ইর্‌ক্ব হলো ছোট পর্বত। ইহা মক্কা হতে (৭২) কিঃ মিঃ অর্থাৎ (৪৮) মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা প্রাচ্য বাসীদের, ইরাক্ব ও ইরান বাসীদের মীকাত।

ইহা স্থানের মীকাত – ঐ নির্ধারিত সীমা সমূহ যা বিনা ইহ্‌রামে অতিক্রম করে মক্কার দিকে যাওয়া কোন হাজ্জ ও উম্‌রাহ কারীর জন্য ঠিক নয়।

এই মীকাত গুলো আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করে গেছেন।

যেমন- ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমার) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ

((وقت رسول الله–ﷺ–لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)) [متفق عليه].

অর্থ ঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনা বাসীদের জন্য যুলহুলাইফা। আর সিরীয়া বাসীদের জন্য আল-জুহ্‌ফাহ। আর নাজদ বাসীদের জন্য ক্বার্‌নুল মানাযেল। ইয়েমেন বাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নির্ধারণ করেছেন। ঐ মীকাত গুলো ঐ এলাকা

বাসীদের জন্য। আর যারা হাজ্জ ও উম্‌রাহ করার উদ্দেশ্যে ঐ স্থানে পৌঁছবে, তাদের জন্যও মীকাত নির্ধারিত হল। আর যারা মীকাতের ভিতরে অবস্থান করে তাদের ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান হবে তাদের নিজস্ব অবস্থান স্থল, এমনকি মক্কার লোক মক্কাতেই ইহ্‌রাম বাঁধবে। [বুখারী মুসলিম]

ولمسلم من حديث جابر -ﷺ-: ((مهل أهل العراق ذات عرق)).

অর্থ ঃ মুসলিম শরীফে জাবির (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর হাদীসে আছে। ইরাক্ব বাসীদের ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান হলো যাতে ইর্‌ক্ব।

যে ব্যক্তি ঐ মীকাত সমূহের কোন একটি মীকাত দিয়ে অতিক্রম করবে না, সে ঐ সময় ইহ্‌রাম বাঁধবে যখন সে জানতে পারবে যে, সে ঐ মীকাত সমূহের একটি মীকাতের বরাবর হয়েছে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আকাশ পথে বিমানে আরোহণ করবে সে ঐ মীকাত সমূহের যে কোন একটি মীকাতের নিকটবর্তী হলে সে ইহ্‌রাম বাঁধবে। বিমানে আরোহী ব্যক্তির জন্য জিদ্দা এয়ার পোর্টে নেমে ইহ্‌রাম বাঁধা ঠিক হবে না, যেমনটি কিছু হাজী সাহেবগণ করে থাকেন।

কারণ জিদ্দা শুধু জিদ্দা বাসীদের মীকাত বা জিদ্দা তাদের জন্য মীকাত যারা তথা হতে হাজ্জ ও উম্‌রার নিয়াত করবে।

তাই জিদ্দা বাসী ছাড়া যে কেও তথা হতে ইহ্‌রাম বাঁধলো সে (হাজ্জের) একটি ওয়াজিব পরিত্যাগ করলো। আর তা হলো মীকাত হতে ইহ্‌রাম বাঁধা। এর কারণে তার উপর একটি ফিদ্‌য়া অপরিহার্য হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করবে তার কর্তব্য হবে তথায় ফিরে যেয়ে ইহ্‌রাম বেঁধে আসা। আর সে যদি তথায় ফিরে না যায় বরং যে স্থানে পৌঁছেছে

সে স্থান হতেই ইহ্‌রাম বেঁধে নেয় তবে তার উপরও একটি ফিদ্‌য়াহ অপরিহার্য হবে। আর তা হল একটি বক্‌রি জবেহ করা, বা উট ও গরুর এক সপ্তাংশে অংশীদার হওয়া, আর তা হারামের মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করা, এবং তা হতে কিছু ভক্ষণ না করা।

হাজ্জ আদায়ের পদ্ধতি ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে গোসল করে পরিস্কার পরিছন্ন হয়ে, চুলের যা কর্তন করা বৈধ তা কর্তন করে শরীরে সুগন্ধি লাগিয়ে ইহরামের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া মুস্তাহাব। পুরুষ লোক সিলাই যুক্ত কাপড় খুলে ফেলবে। পরিস্কার পরিছন্ন সাদা দু'টি-লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করবে। সঠিকমতে ইহ্‌রামের জন্য কোন বিশেষ সালাত (নামায) নেই, তবে ইহ্‌রাম বাঁধাটা যদি কোন ফরয নামাযের সময় হয়, তবে ফরয নামাযের পর ইহ্‌রাম বাঁধবে, কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরয নামাযের পর ইহ্‌রাম বেঁধে ছিলেন।

অতঃপর তিন প্রকার হাজ্জ- তামাত্তু', ক্বিরান, ইফ্‌রাদ যেটার ইচ্ছা করবে সেটার ইহ্‌রাম বাঁধবে।

– তামাত্তু' হাজ্জের সংজ্ঞা ঃ হাজ্জের মাসে উম্‌রার ইহ্‌রাম বেঁধে তা পুরা করে ঐ বছরেই হাজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা হলো তামাত্তু' হাজ্জ।

– ক্বিরান হাজ্জের সংজ্ঞা ঃ হাজ্জ ও উম্‌রার এক সাথে ইহ্‌রাম বাঁধা, অথবা প্রথমে উম্‌রার ইহ্‌রাম বাঁধা, পরে উম্‌রার তাওয়াফ শুরু করার আগেই হাজ্জকে উম্‌রার সাথে জড়িত করে নেওয়াই ক্বিরান হাজ্জ। অতঃপর মীকাত হতে হাজ্জ ও উম্‌রার উভয়ের নিয়াত করবে বা উম্‌রার তাওয়াফ শুরু করার আগেই হাজ্জ ও উম্‌রা উভয়ের নিয়াত করবে। তারপর হাজ্জ ও উম্‌রা উভয়ের তাওয়াফ ও সা'ঈ করবে।

– **ইফ্‌রাদ হাজ্জের সংজ্ঞা ঃ** মীকাত হতে শুধু হাজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা ও হাজ্জের সকল কর্ম সম্পাদন করা পর্যন্ত ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকা হলো ইফ্‌রাদ হাজ্জ।

মাসজিদে হারামের অধিবাসী নয় এমন-তামাত্তু‘ ও ক্বিরান কারীর উপর হাদী অপরিহার্য। তিন প্রকার হাজ্জের কোনটি উত্তম এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

বিদ্যানগণের মধ্যে কিছু কিছু বড় মুহাক্কেকীনদের নিকট তামাত্তু‘ হাজ্জ উত্তম।

তারপর যখন এই তিন প্রকার হাজ্জের যে কোন একটি হাজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধবে, তখন ইহ্‌রামের পর লাব্বাইক বলবে ঃ

((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)).

উচ্চারণ ঃ লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি‘মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক লা-শারীকা লাকা।

তালবীয়াহ বেশী বেশী পাঠ করবে। পুরুষ লোক উচ্চ-শব্দে পাঠ করবে।

محظوراته: وهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي تسعة:

ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কর্ম সমূহ ঃ আর তা হলো ইহ্‌রাম বাঁধার কারণে মুহ্‌রিম ব্যক্তির উপর যা সম্পাদন করা হারাম, তা সর্ব মোট নয়টি ঃ

এক ঃ চুল মুন্ডানো বা অন্য কিছুর মাধ্যমে সমস্ত শরীর হতে চুল উঠানো।

কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী হলো ঃ

﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩٦].

অর্থ ঃ যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু উহার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মাথা মুন্ডন করিও না। [সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৯৬]

দুই ঃ বিনা অজরে নখ কাটা, তবে অজর থাকলে নখ কাটা জায়েয হবে, যেমন অজরের কারণে হাল্‌ক বা মাথা মুন্ডানো জায়েয। কারণ এর দ্বারা চাকচিক্য অর্জিত হয় তাই ইহা চুল উঠানোর সাদৃশ্যে পরিনত হয়।

তিন ঃ মাথা ঢাকা, কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুহ্‌রিমকে পাগড়ী পরতে নিষেধ করেছেন যে মুহ্‌রিমকে তার উট পা দিয়ে পিসে দিয়েছিল, তার ব্যাপারে তাঁর (রাসূলের) বাণী ঃ

((ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) [رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما].

অর্থ ঃ তার মাথা ঢাকিওনা, কারণ কিয়ামাত দিবসে তাকে তালবীয়াহ পাঠ করা অবস্থায় উঠানো হবে। [এই হাদীসটি বুখারী ও

মুসলিম ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমার) বরাতে বর্ণনা করেছেন]

আর ইবনে উমার বলতেন ঃ

((إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها))

[رواه البيهقي بإسناد جيد].

অর্থ ঃ পুরুষের ইহ্‌রাম হলো তার মাথায়, আর মহিলাদের ইহ্‌রাম হলো তার চেহারায় বা মুখে। [ইমাম বাইহাকী এই হাদীসটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন]

চার ঃ পুরুষের সিলাই যুক্ত কাপড় পরিধান করা ও মুজা পরিধান করা। কারণ আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ

((سئل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوباً مسّه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)) [رواه البخاري ومسلم].

অর্থ ঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মুহ্‌রিম ব্যক্তি কি পোষাক পরিধান করবে ? তিনি বল্‌লেন ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তি কুর্তা, পাগড়ী, বুরনুস (এমন পোষাক যা সম্পূর্ণ মাথা আবৃত করে রাখে), পায়জামা পরিধান করবে না, ওয়ারস ও যাফরান যুক্ত কাপড়ও পরিধান করবে না, মুজাও পরিধান করবে না। তবে যদি সে জুতা না পায় তাহলে মুজা পায়ের গিরার উপরিভাগ কর্তন করে পরিধান করবে, যাতে মুজা পায়ের গিরার নিচে থাকে। [বুখারী মুসলিম]

পাঁচ ঃ সুগন্ধি ব্যবহার করা।

((لأن النبي ﷺ أمر رجلا في حديث صفوان بن أمية بغسل الطيب)) [رواه البخاري ومسلم].

অর্থ ঃ কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাফওয়ান ইবনে ই'লা ইবনে উমাইয়াহ এর হাদীসে এক ব্যক্তিকে সুগন্ধি ধুয়ে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন। [এই হাদীস বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ মুহ্‌রিম ব্যক্তির ব্যাপারে বলে ছিলেন যাকে তার উট পা দিয়ে পিসে দিয়েছিলেন।

((لا تحنطوه)) [رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس].

অর্থ ঃ তাকে সুগন্ধি লাগাইওনা। [হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমার) বরাতে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

ولمسلم: ((ولا تمسوه بطيب))

অর্থ ঃ মুসলিম শরীফে আছে তাকে সুগন্ধি দ্বারা স্পর্শ করিও না।

মুহ্‌রিমের জন্য তার ইহ্‌রাম বাঁধার পর শরীরে বা শরীরের কোন অংশে সুগন্ধি লাগানো হারাম।

পূর্ব বর্ণিত ইবনে উমারের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

ছয় ঃ স্থলচর প্রাণী হত্যা করা।

কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী রয়েছে ঃ

﴿يا أيّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصّيد وأنتم حرم﴾ [سورة المائدة، الآية: ٩٥].

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ ! ইহ্‌রামে থাকা কালে তোমরা শিকার-জন্তু বধ করিও না। [সূরা আল-মায়িদাহ-আয়াত-৯৫]

আর তা শিকার করাও হারাম, যদিও তা হত্যা বা জখম না হয়।

কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী রয়েছে ঃ

﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً﴾ [سورة المائدة، الآية: ٩٦].

অর্থ ঃ এবং তোমরা যতক্ষন ইহ্‌রামে থাকবে ততক্ষন স্থলের (কোন প্রাণী) শিকার তোমাদের জন্য হারাম। [সূরা আল-মায়িদাহ-আয়াত-৯৬]

সাত ঃ বিবাহ করা। মুহ্‌রিম নিজে বিবাহ করবে না ও নিজের অভিভাবকতায় ও প্রতিনিধিত্বে অপরকে বিবাহ করাবে না, কারণ উসমান (রাযিআল্লাহু আনহু) এর মারফু হাদীসে আছে।

((لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)) [رواه مسلم].

অর্থ ঃ মুহ্‌রিম নিজে বিবাহ করবে না অপরকে বিবাহ করাবে না ও বিবাহের প্রস্তাব ও দিবে না। [এই হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

আট ঃ লজ্জাস্থানে সহবাস করা, কারণ আল্লাহর বাণী রয়েছে ঃ

﴿فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩٧].

অর্থ ঃ অতঃপর যে কেহ এই মাস গুলিতে হাজ্জ করা স্থির করে সে যেন কোন গর্হিতকাজ না করে। [সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৯৭]

ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেন ঃ তা (রাফাস) হলো সহবাস করা।

এর দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾

[سورة البقرة، الآية: ١٨٧].

অর্থ ঃ সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সহবাস বৈধ করা

হইয়াছে। [সূরা আল-বাক্বারাহ্-আয়াত-১৮৭]

উদ্দেশ্য হলো সহবাস করা।

নয় ঃ যৌন আকর্ষণের সাথে নারীদের শরীরে শরীর লাগানো বা চুমু দেওয়া বা স্পর্শ করা। অনুরূপভাবে যৌন আকর্ষণের সাথে তাকানো।

কারণ ইহা হারাম সহবাসের দিকে পৌঁছে দেয়, সুতরাং ইহা হারাম।

এই নিষিদ্ধ কাজে মহিলারা পুরুষদের ন্যায়। তবে মহিলারা বিশেষ কিছু কর্মে পুরুষদের হতে স্বতন্ত্র। মহিলার ইহ্‌রাম হল তার মুখে। তাই মহিলাদের জন্য বুরকা, নিকাব, বা অনুরূপ কিছুর দ্বারা তাদের মুখ ঢাকা হারাম। তাদের জন্য হাত মুজা পরিধান করাও হারাম।

কারণ ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমার) মারফু' হাদীসে আছে ঃ

((ولا تنتقب المرأة المحرم ولا تلبس القفازين)) [رواه البخاري].

অর্থ ঃ মুহ্‌রিম মেয়েরা নিকাব পরিধান করবে না, হাত মুজাও পরিধান করবে না। [হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন]

ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেন ঃ

((إحرام المرأة في وجهها)) [رواه البيهقي بإسناد جيد].

অর্থ ঃ মহিলার ইহ্‌রাম হলো তার মুখে। [হাদীসটি বাইহাকী উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন]

আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ

((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا

حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه)) [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وسنده حسن].

অর্থ ঃ যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সহিত বিদায় হাজ্জে হাজ্জ যাত্রী ছিলাম তখন আমাদের পাশ দিয়ে কাফেলা অতিক্রম করতো। যখন কাফেলার লোকজন আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতো তখন আমরা মাথা হতে চাদর চেহারার উপর ঝুলাইয়া দিতাম। আর যখন তাহারা আমাদেরকে অতিক্রম করে চলে যেত তখন আমরা মুখের উপর হতে কাপড় তুলে দিতাম। [এই হাদীসটি আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন, হাদীসটির সনদ হাসান]

পুরুষের জন্য যেমন চুল উঠানো, নখ কাটা, জানোয়ার হত্যা করা ইত্যাদি হারাম ইহা মহিলাদের জন্যও হারাম, কারণ সে আম খিতাবে শামিল রয়েছে। তবে তারা সেলাই যুক্ত কাপড়, পায়ে মুজা পরিধান করতে পারবে ও তারা মাথা ঢাকতে পারবে।

দ্বিতীয় রুক্ন ঃ আরাফায় অবস্থান।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((الحج عرفة)) [رواه أحمد وأصحاب السنن].

অর্থ ঃ আরাফার অবস্থানই হাজ্জ। [হাদীসটি আহমাদ ও আসহাবুস সুনান বর্ণনা করেছেন]

তৃতীয় রুক্ন ঃ তাওয়াফুল ইফাযা।

কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ [سورة الحج، الآية: ٢٩].

অর্থ ঃ এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের। [সূরা আল-হাজ্জ-আয়াত-২৯]

চতুর্থ রুক্ন ঃ সা’ঈ করা।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)) [رواه الإمام أحمد والبيهقي].

অর্থ ঃ তোমরা সা’ঈ কর, কারণ আল্লাহ তোমাদের উপর সা’ঈ লিখে দিয়েছেন। [হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও বাইহাকী বর্ণনা করেছেন]

٦– واجباته:

৬- হাজ্জের ওয়াজিব সমূহ ঃ

হাজ্জের সর্ব মোট ওয়াজিব সাতটি ঃ

(১) মীকাত হতে ইহ্‌রাম বাঁধা।

(২) সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা, ইহা তাদের জন্য যারা দিনের বেলায় আরাফায় অবস্থান করবে।

(৩) মুয্‌দালিফায় রাত্রি যাপন।

(৪) আইয়্যামে তাশ্‌রীকের (১১, ১২ ও ১৩ই- যুলহাজ্জাহর) রাত্রি গুলোতে মিনায় রাত্রি যাপন করা।

(৫) জামারাত গুলোতে কঙ্কর মারা।

(৬) মাথার চুল মুন্ডানো বা ছোট করা।

(৭) তাওয়াফুল বি’দা করা।

٧– صفته:

৭- হাজ্জের বর্ণনা ঃ

হাজ্জ আদায়ের ইচ্ছা পোষণ কারী ব্যক্তির জন্য ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করা সুন্নাত। নিজ শরীরে যেমন তার মাথায় ও দাঁড়িতে সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত। সাদা লুঙ্গী ও চাদর পরিধান

করা সুন্নাত। মহিলা সৌন্দর্য প্রকাশ করে এমন পোষাক ছাড়া যে কোন পোষাক পরিধান করতে পারবে।

তারপর মীকাতে পোঁছে (ইহ্‌রাম বাঁধার সময়) ফরয নামাযের সময় হলে তা আদায় করবে ও তার পর ইহ্‌রাম বাঁধবে। ইহ্‌রাম বাঁধার সময় ফরয নামাযের সময় না হলে দু' রাকা'আত নামায আদায় করবে, অযুর সুন্নাতের নিয়াতে ইহ্‌রামের সুন্নাতের নিয়াতে নয়। ইহ্‌রামের জন্য সুন্নাত নামায রয়েছে একথা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে প্রমাণ হয় নাই। আর যখন নামায শেষ হয়ে যাবে তখন ইবাদাতে (হাজ্জে) প্রবেশের নিয়াত করবে। আর তামাত্তু' হাজ্জকারী হলে বলবে ঃ

(لبيك اللـــهم عمـــرة) (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা উমরাতান)। আর হাজ্জে ইফরাদকারী বলবে ঃ (لبيك اللـــهم حجـــاً) (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা হাজ্জান)। আর হাজ্জে ক্বিরান কারী বলবে ঃ

(لبيك اللهم حجاً في عمـــرة) (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা হাজ্জান ফি উমরাতিন)। পুরুষ ব্যক্তি জোরে বলবে মহিলারা চুপে চুপে বলবে, আর বেশী বেশী তালবীয়াহ পাঠ করবে। যখন মক্কায় পৌঁছবে তখন তাওয়াফ শুরু করবে, হাজারে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ শুরু করবে। আল্লাহর ঘরকে তার বাম দিকে রাখবে। হাজারে আসওয়াদকে লক্ষ্য করবে। তাকে চুমু দিবে বা তাকে স্পর্শ করবে বিনা ভিড়ে যদি সম্ভব হয় তবে তাকে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করবে। অন্যথায় তার দিকে ইশারা করবে ও তাকবীর দিবে।

আল্লাহু আকবার বলবে আর বলবে ঃ

((اللهم ايماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك ﷺ،)).

উচ্চারণ ঃ ((আল্লাহুম্মা ঈমানান বিকা, ওয়া তাসদীকান বিকিতাবিকা ওয়া ওয়াফাআন বিআহদিকা ইত্তেবাআন লিসুন্নাতে নাবীইয়েকা))

আর সাত চক্কর তাওয়াফ করবে। আর যখন রুক্নে ইয়ামানীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন তাকে চুমু ছাড়াই হাত দিয়ে স্পর্শ করবে।

রামল করা তাওয়াফের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর রামল হলো, তাওয়াফে কুদূমের প্রথম তিন শাওতে বা প্রথম তিন চক্করে ঘন ঘন পা রেখে দ্রুত চলা।

কারণ ইবনে উমার এর মুত্তাফাক আলাইহি হাদীস রয়েছে।

তা হলো ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন প্রথম তাওয়াফ করতেন তখন প্রথম তিন চক্করে দ্রুত চলতেন আর বাকী চার চক্করে সাধারণ ভাবে চলতেন।

ইয্তিবা করা তাওয়াফের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর ইয্তিবা হলো ঃ ইহ্রাম অবস্থায় পরিহিত চাদরের মধ্য ভাগকে ডান কাঁধের নীচ দিয়ে চাদরের উভয় কোণ বাম কাঁধের উপর ধারণ করা।

কারণ ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলেন ঃ

((اضطبع رسول الله ﷺ هو وأصحابه ورملوا ثلاثة أشواط)).

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে ও তাঁর সাহাবাগণ ইয্তিবা করেছেন, ও তিন চক্করে রামল করেছেন।

আর ইয্তিবা শুধুমাত্র সাত চক্কর তাওয়াফে সুন্নাত। এর আগে বা পরে সুন্নাত নয়।

বিনয়ের সাথে ও আন্তরিকভাবে নিজের নিকট যে সকল দু'আ পছন্দনীয় সে সকল দু'আ তাওয়াফ করা কালীন সময়ে পড়বে।

রুক্নে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যে বলবে ঃ

﴿ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حستة وقنا عذاب النّار﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٠١].

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আযাবান নার।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নি-যন্ত্রনা হতে রক্ষা কর। [সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-২০১]

প্রতি চক্করে নির্ধারিত দু'আর প্রচলন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে প্রমাণিত নয়। বরং তা বিদ'আত ইসলামে নতুন কাজ।

আর তাওয়াফ তিন প্রকার ঃ তাওয়াফে ইফাযাহ, তাওয়াফে কুদূম, ও তাওয়াফে বিদা'। প্রথমটি রুক্ন, দ্বিতীয়টি সুন্নাত এবং তৃতীয়টি বিশুদ্ধ মতে ওয়াজিব।

তাওয়াফ শেষান্তে মাক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে দু' রাকা'আত নামায পড়বে। মাক্বামে ইব্রাহীম হতে দূরে পড়লেও কোন অসুবিধা নেই। প্রথম রাকা'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আল-ক্বাফিরুন (قل يا أيّها الكافرون) এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখ্লাস (قل هو الله أحد) পড়বে। এই দু' রাকা'আত নামায হালকা হওয়া সুন্নাত। হাদীসে এভাবেই এসেছে। তারপর সাফা ও মারওয়াতে সাত চক্কর সা'ঈ করবে। আর সা'ঈ সাফা হতে শুরু হবে, মারওয়াতে শেষ হবে। আর সাফাতে উঠে নিম্নের আয়াত পাঠ করা সুন্নাত।

﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما ومن تطوّع خيراً فإنّ الله شاكر عليم﴾

[سورة البقرة، الآية: ١٥٨].

উচ্চারণ ঃ ইন্নাস্ সাফা ওয়াল মার্ওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহ ফামান্ হা্জ্জাল বাইতা আবি'তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আই-ইয়াত্তাওফা বিহিমা ওয়ামান তা-তাওয়া' খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শা-কিরুন আলীম।

অর্থ ঃ সাফা ও মারওয়া, আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেহ কা'বা গৃহের হাজ্জ কিংবা উম্‌রাহ সম্পন্ন করে তার জন্যে এই দুইটির তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করলে তার কোন পাপ নেই, এবং কেহ স্বেচ্ছায় সৎকাজ করলে আল্লাহ গুণগ্রাহী সর্বজ্ঞ। [সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-১৫৮]

(أبدأ بما بدأ الله به)

"আল্লাহ যা দ্বারা শুরু করেছেন, আমিও তা দ্বারা শুরু করলাম"।

তারপর সাফা পর্বতে উঠবে। হস্তদ্বয় উত্তোলন করে ক্বিব্‌লা মুখী হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহর একত্বতা বর্ণনা করবে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবে, ও তাঁর প্রশংসা করবে ও বলবে ঃ

((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)).

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওলাহুল হামদু ইহ্য়ী ওয়ায়ামুতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়ীন কাদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আন্জাযা ওআ'দাহু ওয়ানাসারা আবদুহু ওয়াহাযামা আল-আহযাবা ওয়াহদাহু।

তারপর দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধনের জন্য দু'আ

করবে। আর এই দু'আ তিনবার করে পাঠ করবে। তারপর মারওয়ার দিকে যাবে, দুই সবুজ চিহ্নের মাঝে পুরুষের জন্য সম্ভব হলে দ্রত চলা সুন্নাত। তবে কাউকে কষ্ট দিবে না। মারওয়াতে পোঁছে তার উপর উঠবে, ক্বিব্লা মুখী হবে, তারপর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে, সাফাতে যা পাঠ করে ছিল অনুরূপ মারওয়াতে তাই পাঠ করবে। সা'ঈ করা কালীন নিম্নের দু'আটি পাঠ করা উত্তম।

((رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم))

উচ্চারণ ঃ রাব্বিগ ফির ওয়ারহাম ইন্নাকা আনতাল আয়ায্যুল আক্রাম।

কারণ ইবনে উমার ও ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) সা'ঈতে এ দু'আটি পড়তেন। অযু অবস্থায় সা'ঈ করা মুস্তাহাব, কেহ যদি বিনা অযুতে সা'ঈ করে নেয়, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। ঋতুবর্তী মহিলা যদি সা'ঈ করে নেয়, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। কারণ সা'ঈতে অযু শর্ত নয়।

আর সে তামাত্তু' হাজ্জ কারী হলে সম্পূর্ণ মাথার চুল ছোট করবে। মহিলা তার চুল হতে এক পোর-আঙ্গুলের মাথার পরিমাণ ছোট করবে।

আর যদি সে ক্বিরান বা ইফ্রাদ হাজ্জ কারী হয় তবে সে (ইয়াওমুন নাহার)-কুরবানীর দিন যুল হাজ্জ মাসের দশ তারিখে জামারাতুল আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করে হালাল হওয়া পর্যন্ত ইহ্রাম অবস্থায় থাকবে। যুল হাজ্জ মাসের আট তারিখে "তারবীয়ার দিবসে" সূর্য উদয়ের কিছু পরে তামাত্তু' হাজ্জ কারী নিজ বাসস্থান হতে ইহ্রাম বাঁধবে। মাক্কা বাসীদের যে ব্যক্তি হাজ্জ করতে ইচ্ছা করবে সে অনুরূপ করবে।

ইহ্‌রাম বাঁধা কালীন গোসল করবে, পরিস্কার পরিছন্ন হবে ও অন্যান্য কাজ করবে। ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য মাসজিদে হারাম যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ ইহা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত হয় নাই। আমাদের জানা মতে তিনি তাঁর কোন সাহাবাকে এর আদেশও দেন নাই।

বুখারী ও মুসলিমে জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে (সাহাবাদেরকে) বল্‌লেন ঃ

((أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا با لحج)) [الحديث].

অর্থ ঃ তোমরা হালাল অবস্থায় থাক। তারপর তারবীয়ার দিবসে হাজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধ। [আল-হাদীস]

ولمسلم عنه – ﷺ – قال: ((أمرنا رسول الله ﷺ لما أهللنا أن نحرم إذا توا جهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح))

অর্থ ঃ মুসলিম শরীফে জাবির বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন আমরা মিনার দিকে রওনা হলাম তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে ইহ্‌রাম বাঁধার আদেশ দিলেন, তখন আমরা আল-আবত্বাহ নামক স্থান হতে ইহ্‌রাম বাঁধলাম।

তামাত্তু‘ হাজ্জ কারী তার ইহ্‌রাম বাঁধার সময় (لبيـــك حجـــاً) লাব্বাইক হাজ্জান বলবে।

মিনার দিকে বের হয়ে যাওয়া ও তথায় যোহর, আসর, মাগরিব, ও ঈশার নামায পৃথক পৃথকভাবে স্বওয়াক্তে কসর করে পড়া মুস্ত াহাব। তথায় আরাফার রাত্রি যাপন করাও তার জন্য মুস্তাহাব।

কারণ ইহা মুসলিম শরীফে জাবির এর হাদীসে আছে।

তারপর আরাফার দিবসের (যুলহাজ্জ মাসের নয় তারিখের) সূর্য উদিত হলে আরাফায় যাবে। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সম্ভব হলে নামেরায় অবস্থান করা তার জন্য মুস্তাহাব। কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহা করেছেন। আর কারো জন্য যদি নামেরায় অবস্থান সম্ভব না হয় আর সে আরাফায় অবস্থান করে তাতে কোন অসুবিধা নেই। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর যোহর, আসরের নামায এক আযান দু' ইকামাতে একত্রিতভাবে দু'রাকা'আত দু' রাকা'আত করে পড়বে। তারপর মাওকিফ-আরাফায় অবস্থান স্থলে অবস্থান করবে। সম্ভব হলে জাবালে রাহমাতকে তার ও ক্বিবলার মাঝে রাখা উত্তম। অন্যথায় পাহাড় মুখী না হলেও ক্বিবলা মুখী হবে হস্তদ্বয় উত্তোলন অবস্থায় আল্লাহর যিকিরে, বিনয়তা প্রকাশে, দু'আয়া ও কুরআন তিলাওয়াতে পুরোপুরি ভাবে ব্যস্ত থাকা মুস্তাহাব।

কারণ উসামাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছে, তিনি বলেন ঃ

((كنت رديف النبي ﷺ بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول خطامها بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى)) [رواه النسائي].

অর্থ ঃ আমি আরাফার মাঠে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে এক সাওয়ারীতে ছিলাম। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হস্তদ্বয় উত্তোলন করে দু'আ করতে লাগলেন, তাঁর উটনি তাঁকে নিয়ে একটু সরে গেল ও তার লাগাম পড়ে গেল, তারপর তাঁর এক হাত দিয়ে তা উঠিয়ে নিলেন আর তাঁর অপর হাতটি উত্তোলন অবস্থায় ছিল। [হাদীসটি নাসাঈ বর্ণনা করেছেন]

আর সহীহ মুসলিম শরীফে আছে ঃ

((لم يزل واقفاً يدعو حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة))

অর্থ ঃ সূর্য অস্তমিত হওয়া ও পশ্চিম আকাশে হলদে রং দূরিভুত হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দু'আ করতে ছিলেন।

আরাফা দিবসের দু'আ সর্বোত্তম দু'আ।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.)) [رواه مسلم].

অর্থ ঃ সর্বোত্তম দু'আ হলো আরাফা দিবসের দু'আ। আমি ও আমার পূর্বের নাবীগণের পঠিত উত্তম দু'আ হলো ঃ

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল্ মুল্কু ওয়ালাহুল্ হাম্দু ওয়াহুয়া আলা-কুল্লি শাইয়িন কাদীর। হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর নিকট (তার) অভাব, প্রয়োজন, ও বিনয়তা প্রকাশ করা তার উপর অপরিহার্য। আর সে এই সূবর্ণ সুযোগ হারাবে না।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء)) [رواه مسلم].

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিবসে সব চেয়ে বেশী তাঁর

বাঁন্দাকে জাহান্নাম থেকে আজাদ-মুক্তি দান করেন, তিনি তাদের নিকটবর্তী হয়ে তাদেরকে নিয়ে ফিরিশ্তাদের সাথে গর্ব করেন ও বলেন ঃ তারা কি চায়। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

আর আরাফায় অবস্থান হওয়া হাজ্জের রুক্ন। সূর্য ডুবা পর্যন্ত অবস্থান করা ওয়াজিব। হাজী সাহেবদের জন্য নিশ্চিত ভাবে আরাফার সীমান্তের ভিতর অবস্থান করা কর্তব্য।
কারণ অনেক হাজী সাহেবরা এর গুরুত্ব দেন না, ফলে তারা আরাফা সীমান্তের বাইরে অবস্থান করেন। তাই তাদের হাজ্জ হয়না। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর ধীর-স্থীর ও শান্তি পূর্ণভাবে মুযদালিফার দিকে রওনা হবে।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((أيها الناس السكينة السكينة)) [رواه مسلم].

অর্থ ঃ হে মানব সমাজ ! তোমরা ধীর স্থীরতা গ্রহণ কর, তোমরা ধীর স্থীরতা গ্রহণ কর। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

তারপর তথায় পোঁছার পর মাগরিব ও ঈশার নামায আদায় করবে। মাগরিবের তিন রাকা'আত নামায পড়বে, আর ঈশার দু' রাকা'আত নামায পড়বে জমা তা'খীর করে।

হাজীদের জন্য তথায় মাগরিব ও ঈশা নামায আদায় করা সুন্নাত। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তথায় মাগরিব ও ঈশার নামায পড়েছেন। আর যদি ঈশার নামাযের সময় চলে যাওয়ার আশংকা করে তবে তা যে কোন স্থানে পড়ে নিবে।

আর মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করবে। নামায ও অন্য কোন ইবাদাত করে রাত্রি কাটাবে না। কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহা করেন নাই।

কারণ ইমাম মুসলিম জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহু)

হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

((أن النبي ﷺ أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين و لم يسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع حتى طلع الفجر))

অর্থ ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুযদালিফায় পৌঁছলেন এবং তথায় মাগরিব ও ঈশার নামায এক আযান দু' ইকামতে আদায় করলেন এ দু'য়ের মাঝে কোন সুন্নাত পড়েন নাই। তারপর ফজর হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থেকেছেন।

জামরাতুল আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করার জন্য অর্ধ রাত্রি ও চন্দ্র ডুবে যাওয়ার পর অজর গ্রস্থ ও দুর্বল ব্যক্তির জন্য মুযদালিফা হতে মিনায় যাওয়া জায়েয আছে। আর যারা দুর্বল নয় ও দুর্বলের সহযোগিতাতেও নয় এমন ব্যক্তিরা ফজর হওয়া পর্যন্ত তথায় থাকবে। আরাম করার জন্য প্রথম রাত্রে কঙ্কর নিক্ষেপ করার প্রতিযোগিতা যা আজ কাল অধিকাংশ মানুষ করে থাকে, তা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাতের পরিপন্থী।

হাজী সাহেব মুয্দালিফায় ফজর নামায পড়ে আল-মাশ'আরুল হারামে অবস্থান করবে। কিব্লা মুখী হয়ে হস্তদ্বয় উত্তোলন করে পূর্বাকাশ পুরোপুরি ফর্শা হওয়া পর্যন্ত বেশী বেশী আল্লাহকে আহ্বান করবে।

মুয্দালিফার যে কোন স্থানে অবস্থান করলেই তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী রয়েছে ঃ

((وقفت ها هنا وجمع كلها موقف)) [رواه مسلم] و(جمع) هي مزدلفة.

অর্থ ঃ আমি এখানে অবস্থান করলাম, তবে মুয্দালিফা সম্পূর্ণটাই অবস্থান স্থল। এই হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। আর (জামা') অর্থ মুয্দালিফা।

তারপর হাজী সাহেব কুরবানীর দিবসে সূর্য উদিত হওয়ার আগেই মিনায় চলে আসবে, ও জামরাতুল আকাবায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। জামরাতুল আকাবা হলো বড় জামরা যা মক্কার নিকটবর্তী। আর প্রতিটি কঙ্কর ছোলা বুটের চেয়ে একটু বড় হতে হবে। চতুর্দিক হতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয হওয়ার উপর সকল আলেমগণ একমত হয়েছেন। তবে কা'বাকে তার বাম পাশে আর মিনাকে তার ডান পাশে রেখে কঙ্কর নিক্ষেপ করা উত্তম।

কারণ ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছে ঃ

((أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزل عليه سورة البقرة)) [متفق عليه].

অর্থ ঃ তিনি যখন বড় জামরার নিকটে পৌঁছতেন, তখন কা'বাকে তাঁর বাম পাশে আর মিনাকে তাঁর ডান পাশে রাখতেন ও সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন এবং বলেছেন ঃ যার উপর সূরা আল-বাক্বারাহ অবতীর্ণ হয়েছিল তিনি এভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন। [বুখারী ও মুসলিম একত্রিতভাবে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

বড় কঙ্কর, মুজা, ও জুতা নিক্ষেপ করা জায়েয নয়। হাজী সাহেব জামরাতুল আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময় তালবীয়াহ পাঠ ছেড়ে দিবে। হাজী সাহেবদের জন্য আগে কঙ্কর মারা তার পর সে তামাত্তু' বা কিরান হাজ্জ কারী হলে হাদী জবেহ করে কুরবানী করা, তারপর চুল নেড়ে করা বা চুল ছোট করা সুন্নাত। পুরুষের

জন্য নেড়ে করা উত্তম।

কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নেড়ে কারীদের জন্য তিনবার রাহমাত ও মাগফিরাতের দু'আ করেছেন। আর চুল ছোট কারীদের জন্য মাত্র একবার দু'আ করেছেন। যেমন এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তারপর হাজী সাহেব তাওয়াফে ইফাযাহ করার জন্য বাইতুল্লাহতে যাবেন।

আর ইহাই জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহুমার) হাদীসে সুন্নাত হিসাবে বর্ণিত হয়েছে হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। আর তাতে আছে ঃ

((أن النبي ﷺ أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصي الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر))

অর্থ ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে জামরাটি গাছের নিকটে ছিল তার কাছে আসলেন, ও তাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন, আর প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপ কালে "আল্লাহু আকবার" বললেন। কঙ্কর ছেলেদের ব্যবহৃত গুলালের গুলির মত-বা সমান হবে।

আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাত্বনুল ওয়াদী হতে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন। তারপর মিনায় গেলেন, ও কুরবানী করলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাওয়ারীতে আরোহণ করে মক্কায় এসে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফে ইফাযা করলেন, ও তথায় যোহরের নামায আদায় করলেন।

কোন হাজী সাহেব যদি এই চারটি ইবাদাতের কোন একটি ইবাদাতকে অন্য কোন একটি ইবাদাতের আগে করে ফেলে তাতে তার উপর কোন দোষ বর্তাবে না। কারণ বিদায় হাজ্জের ব্যাপারে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীস যা বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে ঃ

((وقف رسول الله ﷺ والناس يسألونه، قال: فما سئل رسول الله ﷺ يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج))

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে ছিলেন, এমতাবস্থায় মানুষেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সেই দিন আগে বা পরে করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ কর কোন ক্ষতি নেই।

হাজী সাহেব যদি তামাত্তু‘ হাজ্জ কারী হন তাহলে তাওয়াফে ইফাযার পর সা’ঈ করবে। কারণ তার প্রথম সা’ঈ উম্‌রার জন্য ছিল। সুতরাং তার উপর হাজ্জের সা’ঈ অপরিহার্য হবে। আর যদি সে ইফরাদ বা কিরান হাজ্জ কারী হন ও তাওয়াফে কুদূমের পর সা’ঈ করে নেন তাহলে দ্বিতীয় বার আর সা’ঈ করবেনা।

কারণ জাবির (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছে ঃ

((لم يطف النبي ﷺ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول)) [رواه مسلم].

অর্থ ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম সাফা ও মারওয়াতে একবার সা’ঈ করেছেন প্রথম সা’ঈ। [এই হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

যারা তাড়াতাড়ী করবেন না তাদের জন্য আইয়্যামুত তাশরীক

যুল হাজ্জ মাসের (এগার, বার, ও তের) তারিখ কঙ্কর মারার দিন ধরা হবে। আর যারা তাড়াতাড়ী করবেন তারা দু' দিন যুল হাজ্জ মাসের এগার, ও বার তারিখ কঙ্কর মারবে।

কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী রয়েছে ঃ

﴿واذكروا الله في أيّامٍ معدوداتٍ فمن تعجّل في يومينِ فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا إثم عليه لمن اتّقى﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٠٣].

অর্থ ঃ তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহকে স্মরণ করবে। যদি কেহ তাড়াতাড়ী করে দু' দিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই, আর যদি কেহ বিলম্ব করে তবে তারও কোন পাপ নেই। ইহা তার জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করে। [সূরা আল-বাক্বারাহ-আয়াত-২০৩]

হাজী সাহেব প্রথম জামরা (ছোট) যা মাসজিদে খাইফের নিকটে তাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। তারপর মধ্য জামরাকে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। তারপর জামরাতুল আকাবাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপ কালে "আল্লাহু আকবার" বলবে। (ছোট) জামরাকে কঙ্কর নিক্ষেপ করে ক্বিবলামুখী হয়ে দাড়িয়ে, তার বাম পাশে রেখে অনেকক্ষণ ধরে লম্বা দু'আ করা সুন্নাত। দ্বিতীয় জামরাকে কঙ্কর মেরে ক্বিবলামুখী হয়ে দাড়ানো, ও তাকে তার ডান পাশে রেখে লম্বা দু'আ করা সুন্নাত। কিন্তু বড় জামরাকে কঙ্কর মারার পর লম্বা দু'আ করা কিংবা দাড়ানো সুন্নাত নয়।

কঙ্কর মারার সময় শুরু হবে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর।

কারণ ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমার) হাদীসে আছে। তিনি বলেন ঃ

((كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا)) [رواه البخاري].

অর্থ ঃ আমরা সময় দেখতে থাকতাম, যখন সূর্য ঢলে যেত তখন আমরা কঙ্কর নিক্ষেপ করতাম। [হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন]

যুলহাজ্জ মাসের তের তারিখের সূর্য ডুবার সাথে সাথে আইয়্যামুত তাশরীকের কঙ্কর মারার সময় শেষ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি যুলহাজ্জ মাসের তের তারিখের সূর্য ডুবে গেল অথচ সে কঙ্কর মারতে পারলো না এর পর সে আর কঙ্কর মারবে না। তার উপর দাম-ফিদয়া অপরিহার্য হবে।

হাজী সাহেব আইয়্যামে তাশরীকের-যুলহাজ্জ মাসের এগার ও বার তারিখের রাত্রি গুলো মিনায় যাপন করবে, আর যে হাজী সাহেবের বার তারিখের সূর্য ডুবে গেল অথচ সে মিনা হতে বের হতে পারলো না তার উপর মিনায় রাত্রি যাপন এবং তের তারিখের কঙ্কর মারা অপরিহার্য হবে।

হাজী সাহেব যদি মক্কা হতে চলে যেতে চান তাহলে তাওয়াফে বি'দা করে চলে যাবেন। কারণ ইহা অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট হাজ্জের ওয়াজিব সমূহের একটি ওয়াজিব। তবে ইহা ঋতুবর্তী মহিলা হতে সাকেত-হয়ে যাবে। (তাকে করতে হবে না) কারণ ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর হাদীসে আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

((لا ينفرّنّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وفي رواية: إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)) [رواه مالك وأصله في صحيح مسلم].

অর্থ ঃ কেহই (মক্কা হতে) চলে যাবে না যতক্ষন না তার সর্ব শেষ সময়টুকু আল্লাহর ঘরের কাছে কাটবে, (অর্থাৎ বিদায় তাওয়াফ না করে কেহই মক্কা ত্যাগ করবে না)। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ ঋতুবর্তী মহিলার জন্য তাওয়াফে বিদা' না করেই চলে

যাওয়া অনুমতি রয়েছে। [হাদীসটি মালেক বর্ণনা করেছেন। আর মূল হাদীসটি সহীহ মুসলিমে আছে]

যে ব্যক্তি তাওয়াফে ইফাযাহ তার ভ্রমণ কাল পর্যন্ত পিছাবে তার জন্য তাওয়াফে ইফাযাই তাওয়াফে বিদা' হিসাবে অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট যথেষ্ট হবে।

যে দু'আটি বুখারী ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেছেন সেই দু'আটি হাজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন কারী ব্যক্তির জন্য পড়া মুস্তাহাব। কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোন ধর্ম যুদ্ধ হতে বা হাজ্জ ও উম্‌রা হতে ফিরতেন তখন প্রত্যেক উঁচু জায়গায় "আল্লাহু আকবার" বলতেন। অতঃপর নিম্নের দু'আটি পড়তেন ঃ

((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)).

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল্ মূল্‌কু, ওয়ালাহুল্ হাম্‌দু ওয়াহুয়া আলা-কুল্লি শাইয়ীন কাদীর। আ-য়েবূনা তায়েবূনা আ'বেদূনা লিরব্বেনা হা-মেদূন, সাদাক্বাল্লাহু ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহ্‌যাবা ওয়াহদাহু।

সমাপ্ত

***